মোনালিসার প্রেমে

www.MurchOna.com

আলতামেরিয়া অথবা অজন্তাগুহার প্রাচীরচিত্রের দাম হয় না, কারণ তা কেনাবেচা যায় না। দেওয়ালেই আঁকা। তাই 'গিনিস বুক অফ রেকর্ডস'-এর মতে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে সর্বোচ্চ মূল্যের শিল্প সম্পদ: মোনালিসা! একবারই তা কেনা-বেচা হয়েছে। ক্রেতা ফরাসী সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস্, বিক্রেতা চিত্রকার স্বয়ং: লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি। চারশো বছর আগে।সেবারও বিক্রেতা স্বেচ্ছায় বিক্রি করেননি, বাধ্য হয়েছিলেন বেচতে। তাই সে দামটা মোনালিসার যথার্থ মূল্য নয়। ফরাসী সম্রাট শিল্পীকে দিয়েছিলেন চার হাজার ফ্লোরিন, 1517 খ্রীষ্টাব্দে (প্রায় আট-ন'শ ডলার) 'গিনিস্ বুক অফ রেকর্ডস্'-এ দামটা নিরূপিত হয়েছে একটি তির্যক পদ্ধতিতে। বর্তমান শতাব্দীতে ঐ ছবিখানিকে আমেরিকায় প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার জন্য একবার ইন্সিওর করার প্রস্তাব ওঠে। তখনই ইনসিওর্ড ভ্যালুটা হয়েছিল দশ কোটি ডলার। অর্থাৎ 1962 সালের হিসাবে একশ কোটি টাকা।

সেটাও ঠিক দাম নয়। ওর ন্যায্য বাজারদর : সাত পয়জার!

চারশ বছর ধরে ওটা রাখা আছে পারীর ল্যুভার (আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্বের সেই শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালাটি, বাংলা হরফে যার বানান ও 'উরুশ্চারণ' নিয়ে বঙ্গভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা শতপন্থী) সংগ্রহশালায়। শুধু মাঝের আড়াই বছর বাদে। সেই ফাঁকটুকু নিয়েই এই গল্প। গল্প নয়, ইতিহাস। বিশে আগস্ট উনিশ শ এগার থেকে চৌঠা জানুয়ারী উনিশ শ চৌদ্দ, দু বছর চার মাস চৌদ্দ দিন।

এ কাহিনীর তথ্যের সিংহভাগ সংগ্রহ করেছি সেম্যুর রাইটের লেখা 'দ্য ডে দে স্টোল দ্য মোনালিজা' (লন্ডন,1981) থেকে । কিছুটা অন্যান্য আর্ট-জার্নাল থেকে, যার মূল উৎস মার্কিন সাংবাদিক কার্ল ডেকার-এর গবেষণা। সেই গবেষকের স্মৃতিচারণ দিয়েই শুরু করি।

উনিশ শ চব্বিশ সালের তেরই এপ্রিল। পারী শহরের উপকণ্ঠ। ঘোড়ার গাড়িটা রোড কার্বের কাছে দাঁড় করিয়ে চালক বললে, আর যাবে না মসিয়োঁ।

হ্যাক্নি-ক্যারেজের একমাত্র আরোহী একজন অল্পবয়সী মার্কিন সাংবাদিক। ফরাসী ভাষাটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না । বস্তুত এরপর গলিপথ এত সরু যে, গাড়ি চলাচল করা সম্ভবপর নয়। গাড়ি থেকে নেমে বললেন, তখন যে বস্তিটার নাম বলেছিলাম, সেন্ত্-মর-দে-ফঁসে সেটা কোনদিকে?

গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে কোচম্যান বললে, মসিয়োঁর কী ধারণা ঐ বস্তিটা ভার্সাই প্রাসাদের মতো বিখ্যাত? খুঁজে দেখুন, এরই কাছে-পিঠে।

ভদ্রলোক কোচম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পদব্রজে রওনা দিলেন।

ওঁর মনে হল আজকের অভিযানের জন্য ওঁর সাজপোশাক উপযুক্ত হয়নি। স্যুট, হ্যাট, টাই, জুতো—সব কিছুই পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। সাংবাদিক হিসেবে ওঁর খেয়াল করা উচিত ছিল এদিকটা। যা হোক, নর্দমার কর্দম এড়িয়ে, শুয়োরের খোঁয়াড়-এর স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনক্রমে

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

এগিয়ে যেতে থাকেন।

পাথর-বাঁধানো পথে কতকগুলো অর্ধউলঙ্গ বাচ্চা খেলা করছিল—এক্কা-দোক্কা জাতীয় কোন খেলা। তারা অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকে—কারও আঙুল মুখে পোরা, কারও নাকের ছেঁদায়। দু-একজন কিশোর। তারা কৌতূহলী।

— মসিয়োঁ ভিন্‌সেন্‌জো পেত্রো কোথায় থাকেন বলতে পার? ছেলেগুলো এ-ওর মুখ-তাকাতাকি করে। বয়ঃজ্যেষ্ঠটি এগিয়ে এসে বললে, দেখছেন না এটা বস্তি! এখানে মসিয়োঁ-মাদমোয়াজেলরা থাকে না।

— আচ্ছা বাপু, না হয় শুধু ভিন্‌সেন্‌জো পেত্রো?

— ইতালিয়ান?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইত্যালিয়ান!

— রঙ-মিস্ত্রি?

— এক্‌জ্যাক্টলি! তুমি ঠিক চিনেছ ভাই।

— মার্কিন ট্যুরিস্ট?

— না না, বললুম যে—ইতালিয়ান রঙ-মিস্ত্রি!

ছোকরা পকেট থেকে আধপোড়া বার্ডস্‌-আই বার করল, জুতোর হীলে এরল-ফ্লীনের কায়দায় ম্যাচ্‌স্টিক জ্বেলে বার্ডস্‌-আইটা ধরালো। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আহ্‌। আমি পেত্রো খুড়োর কথা বলছি না এখন। তোমার কথা। তুমি মার্কিন ট্যুরিস্ট?

ভদ্রলোক জাতে সাংবাদিক। সবরকম পরিস্থিতির জন্যই সদা প্রস্তুত। এ ছোকরা ওঁর গন্তব্যস্থলের হকহদিস্‌ জানে। একে চটালে চলবে না। তাই বললেন, মার্কিন, তবে ট্যুরিস্ট নই, সাংবাদিক। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

— করব। তোমার পকেটে পলমল আছে?

— আছে প্যাকেটটা তোমাকে দেব ঐ পেত্রো-খুড়োর পাত্তা পেলে।

— অল রাইট। এস আমার পিছন-পিছন।

নির্দিষ্ট দরজার সম্মুখে পৌঁছে হাঁক পাড়তে হল না। ওরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। রুক-স্যাক-ঘাড়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সমেত একজন মেহনতি মানুষ তাপ্পিমারা প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল দোর খুলে।

ছোকরা বললে, পেত্রো-খুড়ো! এই মার্কিন ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছেন।

লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

— আপনার নাম মসিয়োঁ ভিন্‌সেন্‌জো পেত্রো? লম্বার্ডির দুমেঞ্জাতে আদি নিবাস?

লোকটা ঢোক গিলল। গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠা-নামা করল। স্বীকারও করল না, অস্বীকারও নয়। করল একটা প্রতিপ্রশ্ন : কী চাই?

— আমার নাম...

ছোকরা ওঁর আস্তিন ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে, আমাকে যদি 'অ্যালেবাই' হিসাবে প্রয়োজন না থাকে তবে আমার ফিজটা মিটিয়ে দিন সিনর, আমি রওনা দিই।

সাংবাদিক ভদ্রলোক নিঃশব্দে ওর হাতে একটি পলমল-সিগ্রেটের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। ছোকরা পিছন ফিরতেই বলেন : আমার নাম কার্ল ডেকার। আমি পেশায় সাংবাদিক, জাতে মার্কিন।

আপনার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোথায় বসে আলোচনাটা করা যেতে পারে?

— কোথাও না! আমি মেহনতি মানুষ। আমার সময়ের দাম আছে। সময়ে হাজিরা দিতে না পারলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়-

— জানি। সেবার হাজরিতে ঘণ্টা-দুই লেট হওয়ায় আপনি ভারি আতান্তরিতে পড়েছিলেন!

— মানে! কী বলছেন আপনি? কবে আবার লেট হলাম আমি?

— একুশে অগাস্ট, এগারো সালে। যদিও তেরটা বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে — একটা বিশ্বযুদ্ধই পাড়ি দিয়েছেন, তবু ঐ দিন লেট হওয়ার কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার! লেট অবশ্য আপনি হননি, হয়েছিল : ভিন্‌ পেরুগিয়া!

আবার লোকটার গলকণ্ঠটা ওঠানামা করল। দেখলে মনে হয় বছর-পঞ্চাশ বয়স, কিন্তু কার্ল সন্দেহাতীতভাবে জানেন ওর বয়স বেয়াল্লিশ।

জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেটে নিয়ে লোকটা আবার বললে, কে মশাই আপনি? কী চান?

কার্ল হেসে বলেন, এখনি সে কথা বলেছি আমি। আবার বলব?

রঙ-মিস্ত্রিটা তার পুঁটুলি কাঁধে ফেলে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হল। পিছু পিছু কার্ল, পাশাপাশি চলার উপায় নেই বলে। গলিপথটা এতই সরু।

পিছন থেকে কার্ল ডেকার একনাগাড়ে বকবক করতে করতে চলেছেন, আপনি এভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। আমি আসছি নিউ-ইয়র্ক থেকে। এতটা পথ এসে আমি খালি হাতে ফিরে যেতে পারি না। লা জ্যকোন্ডার ইলোপমেন্ট সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জানেন...

— লা জ্যকোন্ডা! মানে মোনালিসা?

— ইয়েস স্যার! আমি মোটামুটি সব কথাই জানি। শুধু দু-একটি ফাঁক-ফোঁকর ভরিয়ে নিতে চাই প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে...

— প্রত্যক্ষদর্শী? 'দর্শী?'

— না কথাটা ভুল বলেছি আমি! আমি ওটুকুও জানিনা। আপনিই ঐ ইলোপমেন্ট-কেস-এর মূল নিয়ামক।

— অ্যাদ্দিন পরে ও-সব ছেদোঁ কথার কী প্রয়োজন?

কার্ল অনেক-অনেক কিছু জানতেন। কোন্‌ তন্ত্রীতে কীভাবে আঘাত করলে কেমন সুরে বাঁশী বাজবে, সেটাও। তাই বললেন, প্রয়োজন আপনার নেই মসিয়োঁ পেত্রো। আর্ট ইতিহাসের আছে! নেপোলিয়ঁ' বোনাপার্তের লুটের প্রতিবাদ করতে আপনি যেভাবে ইতালীর স্বার্থে...

— ওটা ভুল ধারণা আপনার! নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তে ঐ ছবিটা ইতালী থেকে অপহরণ করে আনেনি!

— আমি জানি। কিন্তু সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই তো ভিন্‌সেনজো পেরুগিয়া সাচ্চা ইতালিয়ানের মতো...

— সে-কথা অবশ্য বলতে পারেন! কিন্তু কী জানেন? ইতিহাসটা বেদনাবহ। আর আমার স্ত্রী অসুস্থ। সময়ে হাজরি দিতে না পারলে আমার মালিক-শালা ফ্রাঁ কাটবে। এমনিতে দৈনিক সে চার-ফ্রাঁ মজুরি দেয়। তাতে সংসার চলে না...

ইতিমধ্যে ওরা বড়রাস্তায় এসে পৌঁচেছে। বাস-স্ট্যান্ডের সামনে কাঁধ থেকে বস্তাটা নামিয়ে

রঙ-মিস্ত্রিটা বললে, রোব্বার আসবেন। সেদিন আমার ছুটি।
— আমার শনিবার জাহাজের টিকিট বুক করা আছে। মার্সেল্‌স্‌ থেকে।
— সে-ক্ষেত্রে আমি দুঃখিত। আমার সময়ের দাম আছে।
কার্ল হিপ-পকেট থেকে ওয়ালেটটা টেনে বার করলেন। একটি পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট এবং একটি পঁচিশ সেন্টের মুদ্রা বার করে বললেন, সে দাম আমি নিশ্চয়ই মেটাব।
রঙ-মিস্ত্রির চোখটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, আমার পকেটে পঞ্চাশ-ফ্রাঁ নোটের ভাঙানি নেই।
— ভাঙানি লাগবে না। গোটা নোটখানাই আপনার। মসিয়োঁর একবেলার সময়ের দাম।
লোকটা ঢোক গিলে বললে,আর ঐ পঁচিশ সেন্টের কয়েনটা?
কার্ল রাস্তার বিপরীত দিকে একটা 'বার'-এর দিকে নির্দেশ করে বলেন,ঐ বারে বসেই আমরা আলোচনাটা করতে পারি। বলা বাহুল্য, বিল মেটাবো আমি। আর এই মুদ্রাটা একটা টেলিফোন-কল বাবদ। আপনি আপনার এম্‌প্লয়ারকে জানিয়ে দিন কাল রাত্রে হঠাৎ জ্বর হওয়ায় আজ কাজে যেতে পারছেন না।
ভিঙ্গ প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল। মোনালিসা-অপহরণের ইতিকথাটা ওর পক্ষে সত্যই বেদনাবহ। সে-কথা ও ভুলে থাকতে চায়। কারও সঙ্গে কখনো আলোচনা করে না। মায় ওর সদ্যপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গেও নয়। কিন্তু পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোটখানা ভদ্রলোকের দু-আঙুলে যে তখনো ধরা আছে! ভিঙ্গ বললে, কিন্তু আপনি যে সত্যই সাংবাদিক, গুপ্তচর বা পুলিসের লোক না তা আমি জানব কি করে?
— গুপ্তচর কি পুলিসে কি আজও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?
— না, তা অবশ্য নয়। সব 'কেস'ই চুকে-বুকে গেছে। কিন্তু আপনি কী উদ্দেশ্যে আবার সেই পুরনো কাসুন্দি নতুন করে ঘাঁটতে চাইছেন, সেটা তো আমার জানা দরকার।
কার্ল এবার পকেট থেকে বার করলেন একটি ফটোগ্রাফ। বাড়িয়ে ধরে বললেন, এঁকে চেনেন?
লোকটার মুখ বেদনার্ত হয়ে উঠ্‌ল। বললে, চিনি।
— একেই কি আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন না?
— না!
— না? সত্যি বলছেন?
— সত্যিই বলছি মসিয়োঁ ডেকার! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, আপনি কাহিনীর সবটা জানেন না। হ্যাঁ, এই লোকটাকে একদিন আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। সে আমলে স্বয়ং যীসাস্‌ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি হয়তো বলে বস্‌তুম—তোমাকে তো খুঁজছি না দাদা! আমি খুঁজছি সিনরকে।
— একে এখন খুঁজছেন না কেন?
— কারণ ওকে আমি খুঁজে পেয়েছি! ওকে আমার প্রয়োজন নেই এখন!
— আমি বিশ্বাস করি না! বলুন তো এঁর নাম কী?
— মার্কুইস্‌ এদুয়ার্দস্‌ দ্য ওয়ালফিয়েনো! ছ'বছর আগেও দেখেছি শয়তানটাকে!
কার্ল ডেকার পকেট থেকে আর একখানি পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট বার করে বল্‌লেন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে 'আন্ডার-এস্টিমেট' করেছিলাম! আপনার একবেলার সময়ের দাম অন্তত একশ ফ্রাঁ!

ভিঙ্গ আর আত্মসংবরণ করতে পারল না! নোট দুখানা আর মুদ্রাটা ছিনিয়ে নিল। পুঁটুলিটা কাঁধে ফেলে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে গেল সরাইখানার দিকে।
কার্ল চললেন তার পিছু পিছু।

তের বছর আগেকার দিনটিতে পিছিয়ে যাওয়া যাক এবার।
বাইশে আগস্ট, উনিশ শ' এগারো।
সময়কালটার ধারণা করতে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ বছর ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মোহনবাগান ঐ বছর প্রথম আই.এফ.এ.শীল্ড পায়, আর ঐ বছরই 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রয়াত হন।
বগলে ঈজেল আর ঝোলা-ব্যাগে রঙ তুলি নিয়ে লুই বেনো হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলেছে সীন নদীর কিনার বরাবর। মঙ্গলবার সকাল আটটা। ল্যুভার সংগ্রহশালার দরজা খোলে সকাল নয়টায়। দ্বার খোলামাত্র নির্দিষ্ট স্থানে জায়গা দখল করে ওকে বসে পড়তে হবে। এ বছর ওর ছবির কাটতি বেশ ভাল। এখন সিজনটাইম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্যুরিস্ট এসে জোটে ফ্রান্সে—শীতালী পাখির মতো। কিনে নিয়ে যায়—রাফায়েল,তিজিয়ানো, মুরিল্লো, রুবেন্স, রেনোয়ারের 'ফ্যাক্‌সিমিলি'—হুবহু নকল। না, হুবহু নয়। হয় মাপে কিছু ছোট, অথবা কিছু বড়। একই স্কেলে ছবি আঁকা বারণ। যাতে নকল ছবি কেউ আসল বলে চালাতে না পারে।
যে আমলের কথা, তখন কালার্ড ফটোগ্রাফি বাজারে আসেনি। রঙিন প্রিন্ট যা পাওয়া যায় তাও নিম্নমানের। তাই এই বেনোর মত আর্টিস্টদের কদর।
পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায়—ল্যুভারে, উফিজিতে, রাইখস্‌-এ প্রতিদিন স্থানীয় চিত্রকরেরা বসে বসে ওল্ড-মাস্টার্সদের কপি করে। রঙিন তেলরঙের ছবি—হুবহু নকল, শুধু মাপে কিছু বড়,অথবা ছোট। ভাল দামে তা বিক্রি হয়ে যায়। বেনো ল্যুভারের অনেক বিশ্ববন্দিত ছবির কপি করেছে। সবই বিক্রি হয়ে গেছে। এ বছর সে একটু রকমফের করবে স্থির করেছে। বর্তমানে আঁকছে একটা তেলরঙের ছবি 'সালোঁ কেয়ারে।'
অর্থাৎ ল্যুভার মিউজিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত কামরার একটি ছবি।
ফোর-গ্রাউন্ডে কিছু দর্শক, দু'পাশের প্রাচীর পরিপ্রেক্ষিত—আইন মেনে ধেয়ে চলেছে যুগল ভানিশিং পয়েন্টের দিকে। 'ওয়র্মস্‌-আই'-ভিয়ু-তে আঁকা ছবি। কারণ বেনো আঁকে মেঝেতে আসন জুড়ে বসে। ছবির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, দু'পাশের প্রাচীরে বিশ্ববন্দিত ছবিগুলিকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। বেনো এমন নিখুঁত করে আঁকছে যে,প্রতিটি ছবিকে সনাক্ত করতে পারবে সত্যিকারের চিত্র-প্রেমিক। কিন্তু সেগুলি 'ফ্রন্ট-ভিয়ু' নয়, পাশ থেকে আঁকা। ও যেখানে বসে দৃষ্টিকোণটা বেছে নিয়েছে সেখান থেকে দেখা যায় বিশ্বললিতকলার পরপর তিনখানি সাচ্চা হীরকখণ্ড! করেজ্জোর 'সেন্ট ক্যাথারিনের অলৌকিক বিবাহ', টিশিয়ানের 'আলিগরি' আর দুটির মাঝখানে ল্যুভার-চিত্রমালার কৌস্তুভ-মণি।
লেঅনার্দোর 'লা জ্যকোন্ডা',অর্থাৎ মোনালিসা।
বেনো যখন ল্যুভারে গিয়ে পৌঁছল তখন সদর দরজা সবে খোলা হয়েছে। ওকে প্রত্যহ টিকিট কাটতে হয় না। গিল্ড-এর ইস্যু-করা 'পাস' আছে। তাছাড়া ওকে অনেকেই চেনে। আজ

তিনবছর সে ক্রমাগত আসছে ল্যুভারে। বেনো তর্‌তর্‌ করে গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্স বেয়ে দ্বিতলে উঠে যায়।

এখন যে কক্ষে 'মোনালিসা' থাকে সে আমলে সেখানে ওটা থাকত না। তখন ওটা থাকত সালোঁ কেয়ারে।

তার দরজাও এইমাত্র খুলেছে। দু-একজন দর্শনার্থী প্রবেশ করেছে। প্রবেশপথে দেখা হয়ে গেল পপাদুঁ'র সঙ্গে। এই গ্যালারির রক্ষক। বলে, এরি মধ্যে হাজির?

একগাল হেসে বেনো জবাব দেয়, উপায় কী বল? 'সিজন' তো বসে থাকবে না!

নির্দিষ্ট স্থানে মসৃণ মার্বেলের ওপর সে থাপন জুড়ে বসে পড়ে। ঈজেলটা খাটায়। রঙ-তুলি সাজিয়ে আঁকতে শুরু করে। কয়েক মিনিট পরেই ওর নজর পড়ল করেজ্জো আর টিশিয়ানের মাঝখানে মহিলাটি অর্থাৎ মোনালিসা অনুপস্থিত।বেনো বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না। আজ মঙ্গলবার, অর্থাৎ গতকাল গেছে সোমবারের ঝাড়া-মোছার দিন। প্রতি সোমবার ল্যুভার দর্শনার্থীদের কাছে বন্ধ। সেদিন সব সাফ-সুৎরো করা হয়। হয়তো 'লা জ্যকোন্ডা' ছবিখানার ফ্রেম পালিশ করা হচ্ছে। অথবা হয়তো তা থেকে ফটো তোলা হচ্ছে। একটু-পরেই কর্মীরা এসে ওটা টাঙিয়ে দেবে। সে প্যালেটে রঙ মেশায়।

মন বসে না কিন্তু। কোথায় একটা কাঁটা খিচ্‌খিচ্‌ করছে। সালোঁ কেয়ারের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে বেনো, অথচ ঘরে লিজা জ্যকোন্ডা নেই! এটা ওর বরদাস্ত হচ্ছে না। এ যেন বিগ্রহহীন শ্রীমায়ের মন্দিরে বসে থাকা! বেনো উঠে এল পপাদুঁর কাছে। লোকটা টুলে বসে এই সাত সকালেই ঝিমচ্ছে! রাতে ঘুমায় না নাকি? বেনো ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এই! লা জ্যকোন্ডাখানা কোথায়?

রক্ষকের তন্দ্রাজড়িত চোখ জোড়া খুলে গেল। এতক্ষন ওর মুখটা হাঁ করা ছিল। সেটা বন্ধ করল। জিভ দিয়ে লালা টেনে নেওয়ার একটা শব্দও হল, স্লপ্‌! তাকিয়ে দেখল সামনের দেওয়ালটার দিকে। হ্যাঁ, মোনালিসা ছবিখানা স্বস্থানে নেই বটে। সেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। মনে পড়ল—আজ মঙ্গলবার। কাল সোমবার, ঝাড়া-মোছার দিন গেছে। নিঃশব্দে তিনতলার দিকে 'থাম্‌স্‌-আপ' মুদ্রা করে আবার চোখ দুটি বোঁজে।

বেনো নিশ্চিন্ত হয়। তিনতলায় স্টুডিও। তাহলে ফটো-তোলার প্রয়োজনে ছবিখানা ত্রিতলের স্টুডিওতে গতকাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটু পরেই কর্মীরা এসে সেটা টাঙিয়ে দেবে। সে নিশ্চিন্ত মনে আবার আঁকতে বসে।

দশ মিনিটের মধ্যেই তার তন্ময়তাটা ভঙ্গ হল। এক ভদ্রলোক এসে জানতে চাইলেন, মাপ করবেন, আপনি বলতে পারেন—'মোনালিসা' ছবিখানা কোন ঘরে আছে?

বেনো বললে, এ ঘরেই থাকার কথা। ঐ দেওয়ালে। সেখানা গতকাল স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফটো তুলতে।

ভদ্রলোক বললেন, আশ্চর্য! সারাদিন-রাতে ফটো তোলা শেষ হল না? এঁরা কি জানেন না—দূর-দূরান্তর থেকে মানুষজন ঐখানা দেখতেই ছুটে আসে?

কথা ঠিক। বেনো একটু বিরক্ত হয়ে আবার ঘুম থেকে ডেকে তুলল পপাদুঁকে। বললে, কেন এত দেরী করছে ওরা? তুমি যাও—তাগাদা দাও গিয়ে।

পপাদুঁ ঘুম জড়ানো ঘোলাটে দু-চোখ মেলে বললে, এত ব্যস্ত কিসের? এসে যাবে এখনি।

এবার ভদ্রলোকই খেঁকিয়ে ওঠেন। ব্যস্ত হব না? গোটা ল্যুভারটা তো ঘুরে দেখতে হবে সারা দিনে? আপনাদের কম্‌প্লেন-বুকটা কোথায়?

পপাদুঁর নিদ্রা ছুটে গেছে। বললে, ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন। পাঁচ- মিনিটের ভিতরই ছবি নিয়ে ফিরব আমি।

পাঁচ-মিনিটের ভিতরই ফিরে এল সে। একেবার অন্য মূর্তি। কে বলবে একটু আগে সে ঘুমোচ্ছিল! তার চোখ দুটো অক্ষি-কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে!

বেনো উঠে আসে, কী ব্যাপার? কী বলল ওরা?

— 'লা জ্যকোন্ডা' স্টুডিওতে নেই। তাকে কাল ওখানে কেউ নিয়েই যায়নি।

— তার মানে?

— তার মানে আমি জানি না!...আমি...আমি সত্যিই জানি না!

প্রপার-চ্যানেলে মিনিস্টার অফ দি ইন্টিরিয়ার মহোদয়কে যখন দুঃসংবাদটা অবহিত করা হল, তখন বেলা দেড়টা। তার পূর্বে অনেক কিছু ঘটে গেছে। পপাদুঁ দুঃসংবাদটা জানিয়েছে প্রহরীদলের প্রধান জর্জেস পিকোকে। সে বেচারা ফটো-স্টুডিও, ফ্রেম-মেরামতির ঘর, পালিশ-সেক্‌শনের প্রতিটি বিভাগে সন্ধান করে দেখেছে; তারপর জানিয়েছে কিউরেটার মহোদয়কে। তিনিও এই অবিশ্বাস্য-তথ্যটা মেনে নেননি প্রথমে। যে দুর্গ থেকে একটি সূচ গলতে পারে না সেখান থেকে মোনালিসা চুরি হয়ে যাবে এটা ভাবা যায় না। পুলিসে খবর দিয়ে কি শেষমেশ বেহুদ্দো বে-ইজ্জতি হবেন? ফলে সমস্ত বিভাগগুলিতে পুনরায় তল্লাসী করা হল — গতকাল ঝাড়াই-পোঁছাই কাজে কেউ 'লা জ্যকোন্ডা'খানা সরিয়ে রেখেছে কি না। নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি আতঙ্কতাড়িত কণ্ঠস্বরে দুঃসংবাদটা জানালেন পারী-পুলিসের প্রিফেক্ট লুই লাপিন্ সাহেবকে। তিনি জানালেন 'সুরেতে নাশিওনেল'কে অর্থাৎ জাতীয় সুরক্ষা-মন্ত্রকে। তাঁরা সংবাদ দিলেন বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়কে। তিনি স্বয়ং এসে যখন ল্যুভারে উপস্থিত হলেন তখন বেলা তিনটে। সশস্ত্র পুলিশে ঘিরে ফেলল ল্যুভার। প্রতিটি নির্গমনদ্বারের সম্মুখে বেয়নেটধারী পুলিস। প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডিটেকটিভ। ছবিখানা দেওয়াল থেকে নামানো হয়েছে এটা প্রত্যক্ষ সত্য—এবার দেখতে হবে সেটা যেন ল্যুভার প্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে কেউ না নিয়ে যেতে পারে।

ওঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, 'লা জ্যকোন্ডা'কে যে অপহরণ করেছে সে ঐ প্রাসাদ-চৌহদ্দি ত্যাগ করে গেছে বত্রিশ ঘণ্টা আগে! সোমবার বেলা আটটায়!

টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। হেতু : একটা পানীয় জলের পাইপ নাকি ফেটে গেছে—সেটা এক্ষণি মেরামত করা দরকার।

যাঁরা সকাল থেকেই ভিতরে ঢুকে পড়েছেন তাঁদের বলা হল, টিকিটের মূল্য রিফান্ড নিয়ে অবিলম্বে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

বিস্মিত বিমূঢ় দর্শনার্থীরা কিউ দিয়ে একে-একে বার হয়ে এলেন। প্রত্যেককে তল্লাসী করা হল। জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার সঙ্গে এই খানা-তল্লাসীর কী সম্পর্ক বোঝা গেল না। সে প্রশ্নটা তাঁরা উত্থাপন করার অবকাশই পেলেন না। পেলেন সাংবাদিকরা। ইতিমধ্যে অসংখ্য ক্যামেরাধারী সদর-দরজার কাছে থানা গেড়েছে। ঘা হলে মাছি আর সাংবাদিকেরা বাতাসে

খবর পায়। ছ্যাঁক গান করে ধরে। কিন্তু প্রেস-কার্ড দেখিয়েও কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারল না। পাইপটা কোথায় ফেটেছে, কত ব্যাসের পাইপ, কোন্ কোন্ ছবি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, মেঝেতে কতটা জল জমেছে — প্রশ্ন ওদের হাজারটা, জবাব কেউ দিল না।

ইতিমধ্যে গোয়েন্দা-পুলিস সিঁড়ির তলায় এক অন্ধকার কন্দর থেকে আবিষ্কার করেছে দুটি জিনিস। একখানা ফ্রেম আর বুলেট-প্রুফ কাচের একটা টুকরো! কিউরেটার নিঃসন্দেহ—সেগুলি 'মোনালিসার'!—

বেলা চারটেয় ল্যুভারের সামনে রীতিমত ট্রাফিক জ্যাম!

আর দেরী করা যায় না! মন্ত্রী মহোদয় জাতীয়-স্বার্থে এই চরম লজ্জাজনক সংবাদটা প্রেসকে জানালেন: 'মোনালিসা অপহৃতা! কী ভাবে তা কেউ জানে না!' প্রেস-প্রতিনিধিরা রুদ্ধশ্বাসে ছুটলো যে-যার দপ্তরে।

পরদিন, বুধবার, তেইশে আগস্ট পারীর এক পাঁচতারা হোটেলের বিলাস-বহুল কক্ষে খবরগুলো তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছিলেন একজন বিদেশী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার সামনেটায় টাক, চুলগুলি ফেরানো। চোখে প্যাঁশনে, ডগ্‌ল্যাস ফেয়ারব্যাঙ্কস মার্কা সূচালো একজোড়া গোঁফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

পারীর তিন্-তিন্‌টি দৈনিকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আট-কলমব্যাপী হেড্‌লাইন:

'অবিশ্বাস্য! চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে!'

'ল্যুভার কানা হয়ে গেল! রাজকুমারী নেই!'

'লা জ্যকোন্ডা অপহৃতা! অ্যাবডাক্‌শন না ইলোপমেন্ট?'

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল বিদেশী ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের মুখে। তিনিই এই অপহরণ-অপেরার মূল-গায়েন!

তাঁকে চিনতে হলে আরও কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে আপনাদের:

জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার বুইনস এয়ার্স-এ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বাবা ছিলেন মস্ত জমিদার। ছোটখাটো রাজাই—বনগাঁয়ে যেমন হয়। ওরা চার ভাই। ও হচ্ছে সর্বকনিষ্ঠ। পিতৃবিয়োগের পর বাকি তিন ভাই জমি ভাগ করে নিল। ও রাজি হল না। সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ নগদে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বার হয়ে পড়ে। প্রথমেই নিল একটা জমকালো স্বয়ং-নিয়োজিত উপাধি। আইভরি-ফিনিশ ভিজিটিং-কার্ডে মনোগ্রাম করে ছাপা হল: Marques Eduards de Valfierno.

থানা গাড়ল বুইনস্ এয়ার্সেই। পিতার দৌলতে সেখানকার অনেক ধনী পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিলই। চরিত্রগুণে অনায়াসেই সে গণ্ডিটা বর্ধিত হয়ে গেল অচিরে। দারুণ ফুর্তিবাজ, চোখে-মুখে কথা। যে কোন খানদানী পার্টিতে ওয়ালফিয়েনো অনুপস্থিত হলে মনে হত যেন মোনালিসাহীন সালোঁ কেয়ারে।

একটা জীবিকা অবলম্বন না করলে নয়। এই খানদানি জীবনযাত্রার স্টাইলটা বজায় রাখতে হলে। কিন্তু অর্থোপার্জন মানেই কপালের ঘাম পায়ে ফেলা। সেটা ধাতে নেই ওয়ালফিয়েনোর। কপালটা না ঘামিয়ে মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোকে যদি একটু খেলানো যায় তাহলে বেহুদ্দো

দৌড়ঝাঁপের কী দরকার?

ওয়ালফিয়েনো হল: আর্ট-ডীলার!

মায়া, আজতেক আর রেড-ইন্ডিয়ানদের দিকে য়ুরোপ-আমেরিকা ক্রমশঃ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ওসব সভ্যতার অনেক কিছুই অজানা। সেটাই সুবিধাজনক! বিশেষজ্ঞের দল আসল-নকলের ফারাকটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছেন না। বুইনস্-এয়ার্স্ শহরের একান্তে শহরতলীতে গুটিকতক শিল্পীকে নিয়ে মার্কুইস একটি ওয়ার্কশপ খুলে বসলেন — তারা পাঁচ-সাতশ' হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পসম্ভার বানাতে শিখল! চামড়ার ওপর খোদাই, পোড়ামাটির তৈজস, প্রাচীন মুদ্রা, মাটি ও পাথরের মূর্তি!

বেশিদিন চালানো গেল না। বুইনস্-এয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বেমক্কা খুলে বসল একটি কলা-বিভাগ। আর সেই বিভাগের ডীন হয়ে এসে উপস্থিত হলেন এক জার্মান বিশেষজ্ঞ। মোটা মাইনে পাচ্ছিস্ — তাই নিয়েই খুশি থাক না বাপু — না! তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। সরকারকে বুদ্ধি জোগালেন প্রাচীন আর্ট দ্রব্য বিদেশীদের বিক্রি করবার আগে তাঁর কলা-বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে! কোনও মানে হয়? বিদেশী টুরিস্ট বোকা বন্‌তে চায়, তাতে তোদের নাক গলাবার কী দরকার বাপু?

মার্কুইস পদ্ধতিটা বদলাতে বাধ্য হলেন।

এই পর্যায়ে তিনি যে কৌশলটি অবলম্বন করেছিলেন তা রীতিমতো অভিনব! 'প্রতারণা' যদি কখনো বিজ্ঞানের একটি শাখা বলে স্বীকৃত হয়, মার্কুইস ওয়ালফিয়েনো তা হলে এজন্য গ্যালেলিও-নিউটনের সমপর্যায়ের সম্মান পাওয়ার যোগ্য: তথাকথিত আর্ট-কৌশলী মার্কুইস ওয়ালফিয়েনো রায়ো-ডি-জেনিরোর একটি বিখ্যাত সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একজন আর্টিস্ট বসে মুরিল্লোর একখানি বিখ্যাত ছবি কপি করছে। মার্কুইস চিত্রকরের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রায় আধঘণ্টা নিস্পন্দ ঔৎসুক্যে ওর অঙ্কন-পদ্ধতি দেখতে থাকেন। চিত্রকর ওঁর নীরব উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন; কিন্তু তন্ময় হয়ে সে ছবি আঁকছে। অনেক পরে সে প্যালেট আর তুলি নামিয়ে রেখে মার্কুইসের মুখোমুখি হল। বললে, আপনি এ সংগ্রহশালায় কী দেখতে এসেছেন মশাই, বলুন তো? আসল না নকল ছবি?

মার্কুইস্ একগাল হেসে বললেন, জবাব দেওয়া মুশ্‌কিল। কারণ আসল-নকলের ফারাকটা নজরে পড়ছে না।

শিল্পীও হেসে ফেলে। বলে, মার্কিন টুরিস্ট মনে হচ্ছে? মুরিল্লোখানা সংগ্রহে রাখতে চান?

— কত দাম?

— পঁচিশ পেসো!

মার্কুইস বিনা-দরদামে তৎক্ষণাৎ ওর হাতে প্রার্থিত দামটা ধরিয়ে দেন।

শিল্পী বলে, আর কোন ছবি কিনতে চান? আমার কাছে আরও কয়েকখানি ভাল ছবির কপি আছে।

— আপনি সেগুলি নিয়ে ঐ লনের বেঞ্চিটায় আসুন। আমি একটু ধূমপান করব।

সংগ্রহশালার অভ্যন্তরে ধূমপান বেআইনি। মার্কুইস তাই বাগানে গিয়ে বসলেন। একটু পরে শিল্পী খানকয়েক ছবি নিয়ে উপস্থিত হল। বান্ডিলটা খুলবার উপক্রম করতেই মার্কুইস বললেন, আপনি 'অর্ডারি' ছবি আঁকতে রাজি আছেন? যথাযোগ্য সম্মানমূল্য পেলে?

— 'অডারি ছবি' মানে? বিষয়টা কী?
— এই মুরিল্লোখানাই—ধরুন, ওয়ান-এইট্থ্-স্কেলে বড় করে।
ভ্রূকুঞ্চিত হল শিল্পীর। অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর বলল, কত দেবেন?
— তিন শ' পেসো!
— 'Craquelure' করে দিতে হবে না?
— তা করে দিলে চার শ'।
— আর ফ্রেমটাও বানিয়ে দিলে? পুরনো কাঠে, মরচে ধরা পেরেকে?
— না, তা চাই না! শুধু ছবিখানাই।
শিল্পী বলল, সইটাও চাই তো? মুরিল্লোর?
— সেটা তো বলাই বাহুল্য!
— পাবেন। পরের বুধবারে। এখানেই, এই সময়েই। তবে চার শ' নয়, পুরো পাঁচ শ' দিতে হবে। আর অর্ধেক দাম অগ্রিম।
— রাজি। দুটো কথা বলব। এক নম্বর : ছবিখানা এখানে নয়, আমার হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে। দু নম্বর : আপনার পরিচয়টা জানাতে হবে।
শিল্পী আত্মপরিচয় দিলেন। নাম—ঈভেস্ শাদ্রঁ। জাতে ফরাসী। পারীর বিখ্যাত 'ব্যো আর্ত' আকাদেমী থেকে চিত্রাঙ্কনের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। দীর্ঘদিন লুভ্যারে বসে ছবির নকল করেছেন। সম্প্রতি এসেছেন দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে। আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, মসিয়োঁর পরিচয়?
— আমি দক্ষিণ আমেরিকারই বাসিন্দা। কিন্তু নাম-পরিচয়টা আপনার পক্ষে না-জানাই ভাল নয় কি? নেহাত যদি খানা-তল্লাসি হয়, পুলিস-এন্‌কোয়ারি হয়, তাহলে আপনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই নয়?
— তা ঠিক। কিন্তু ধরুন যদি একখানা 'মুরিল্লো' এঁকেই আমার তৃপ্তি না হয়? হয়তো আরও খান-কয়েক ছবি আপনাকে বেচতে চাইব আমি—ফুলস্কেলে। Craquelure করে।
মার্কুইস বুঝতে পারেন ধুরন্ধর সহকর্মীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি। বাজিয়ে নিতে বলেন, 'Craquelure' পদ্ধতিটা পারীর ব্যো আর্ত স্কুলে শেখানো হয়?
— হয় না। কিন্তু আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন আমি নিতান্ত নভিস্? এ কাজ আগেও করেছি। তবে ঝুঁকিটা বড় বেশি।
— আমার সঙ্গে কারবারে এটাই সুবিধা। সব খরচ-খরচা আমার, সব 'রিস্ক' আমার; তাই লাভের বারো-আনা আমার। সব টেক্‌নিক্যালিটি আপনার, তাই বখরাও বাকি চার-আনা।
— আপনি কি আশা করছেন অরিজিনাল 'মুরিল্লো'-খানা আপনি মাত্র দু হাজার পেসোতে বেচবেন?
— না। পাঁচ শ' পেসোর অফারটা আমার নয়, আপনার। তখনও আপনি পাকাপাকিভাবে আমার সঙ্গে বিজনেসে নামার কথা ভাবেননি। আমার আশা, অরিজিনাল মুরিল্লোখানা অন্তত ছয় হাজারে বেচব। তার চার-আনা তাহলে আপনার।
— মানে! দেড়-হাজার পেসো?
— পেসো নয়, ডলার, মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আপনার হিসাবে চল্লিশ হাজার পেসো!
বজ্রাহত হয়ে গেলেন শাদ্রঁ। এত দাম! কিন্তু ও ভদ্রলোক বেচবে কী করে? কাকে? যে

কিনবে সে কি যাচাই করে নেবে না—নকল কিনছে না আসল? সেই মর্মে প্রশ্ন করতেই মার্কুইস বললেন, সবকিছুই আপনার চোখের সামনে ঘটবে—যাতে আপনি দেখতে পান আমি নগদে কত পেলাম। কিন্তু তার আগে বলুন, 'Craquelure' পদ্ধতিটা আপনার কী জাতের?
— শুধু 'Craquelure' পদ্ধতিটা নিখুঁত হলেই চলবে না, মসিয়োঁ। আমাকে অনেকগুলি সহজলভ্য রঙ এড়িয়ে মূলানুগ হবহু ছবিটা আঁকতে হবে। যেমন ক্যাডমিয়াম ইয়ালো, কোবাল্ট ব্লু, জিঙ্ক হোয়াইট ইত্যাদি ব্যবহার করা চলবে না। তাই চার-আনা নয়—ছয়-আনা ভাগ আমার, যদি নিখুঁত নকল চান। এমন নিখুঁত; যাতে শুধু ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসেই নয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তা ধরা যাবে না।
— আপনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন আগে, তারপর শতকরা ভাগের হিসাব হবে।
শাদ্রঁ প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দেন :
বাজারে এই শতাব্দীর প্রথমে যে সব রঙ শিল্পীরা ব্যবহার করতেন তা দু'তিন শ' বছর আগেকার শিল্পী—ভেরমিয়ার, মুরিল্লো, ফ্রান্স হাল্‌স্ বা রেমব্রান্ট ব্যবহার করেননি। তা তখন বাজারে পাওয়া যেত না। রঙিন পাথর ঘষে ঐসব রঙ তাঁদের নিজেদেরই তৈরী করে নিতে হত—যেমন করেছেন আলতামেরিয়ার আদিম শিল্পী থেকে অজন্তা গুহাশিল্পীরা। এছাড়া দু-তিন-চারশ' বছরের পুরনো অয়েল পেন্টিং-এ এক ধরনের চুল-ফাট অনিবার্য! সেটা মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনের পরিণাম। সদ্য-প্রস্তুত ছবিতে কৃত্রিমভাবে ঐ চুল-ফাটের দাগ বানাতে হবে। এজন্য দুই-কোট আস্বচ্ছ ভার্নিশের প্রলেপ দিতে হবে সদ্য সমাপ্ত চিত্রে। প্রথম কোট বা আন্ডার-লেয়ারটা হবে এমন জাতের ভার্নিশ যা শুকিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় নেয়; আর তার ওপরের প্রলেপটা হবে শীঘ্র-শুকিয়ে ওঠার উপযুক্ত কোনও ভার্নিশ। দু-দুটো আস্বচ্ছ ভার্নিশের প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। ফ্যানের হাওয়ায়। যেহেতু দুটি প্রলেপ ঐ হাওয়ার প্রকোপে ভিন্নভাবে শুকিয়ে উঠবে তাই রঙের ওপর মাকড়শার জালের মতো চুল-ফাট দেখা দেবে! তাকেই বলে 'Craquelure'। তখন তার ওপর খুব হাল্‌কা করে গ্রাফাইট-স্প্রে করতে হবে—যাতে একটু পুরনো-পুরনো দেখায়—রঙের চেকনাই কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।
প্রক্রিয়াটা আদ্যোপান্ত শুনে মার্কুইস্ জানতে চাইলেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়বে না?
— যদি না রীতিমতো কোনও বিশেষজ্ঞ—সাধারণ আর্ট কনৌশার নয়— এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন রসায়নবিদ ছবিটা পরীক্ষা করেন।
মার্কুইস এরপর দশ-আনা ছয়-আনা ভাগে স্বীকৃত হয়ে গেলেন। শাদ্রঁর প্রথমটা মনে হয়েছিল আট-আনা বখরা হওয়া উচিত ছিল—তার কেরামতির মূল্য দিতে। কিন্তু মার্কুইস-এর বিক্রয়-পদ্ধতির কেরামতি দেখে পরে তিনি মনে মনে স্বীকার করেছিলেন : লোকটার প্রাপ্য হওয়া উচিত দশ-আনা ভাগেরও বেশি!
নিখুঁত ব্যবস্থাপনা মার্কুইস-এর। শাদ্রঁ গোপনে ছবিখানা অরিজন্যাল-মাপে বর্ধিত আকারে পুনরায় আঁকতে, কৃত্রিমভাবে তাতে চুলফাট ধরাতে যে সাতদিন সময় নিলেন তার ভিতর মার্কুইস সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁর জাল বিস্তার করলেন। বিদেশী টুরিস্টদের যারা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই জাতের গাইডদের একে-একে টোকা মেরে দু'তিনটি উপযুক্ত সহকর্মী বেছে নিলেন। যারা দোভাষী, যারা বোকাসোকা ধনী টুরিস্টদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ সংগ্রহশালার একজন গার্ডকে স্বদলে নিলেন। এমন একটি গার্ড যার বিবেক

অর্থমূল্যে ক্রয় করা যায়। তার তরফে একটিমাত্র শর্ত : কর্তৃপক্ষ যখন টের পাবেন যে, ছবিখানা চুরি হয়ে গেছে তখন যেন তার চাকরি নিয়ে টানাটানি না পড়ে।

মার্কুইস তাকে আশ্বস্ত করলেন, তুমি আমার পরিকল্পনাটা আদৌ বুঝতে পারনি। আমার সঙ্গে কারবারে ঐটাই সুবিধে। সব 'রিস্ক', সব ঝুঁকি আমার! তোমাকে যেটুকু করতে হবে তার মধ্যে বেআইনি কিছু নেই। শুধু সময়ে একটু পিছন ফিরে থাকা। এ জন্যই ছবি-পিছু তোমাকে একশ পেসো দেব আমি!

গার্ডটা বললে, মশাই! আমি কচি খোকাটি নই! ঘটনার পরদিন তো ছবিখানা ঐ দেওয়ালে থাকবে না? তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে—আমি কী বলব?

— তখন তুমি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে — 'এই ভদ্রলোক ছবিটা চুরি করেছেন।' পারবে না?

— মানে? আপনি বুঝি তার আগেই কেটে পড়বেন না?

— না! তার মানে ছবিখানা পরদিন দেওয়ালেই টাঙানো থাকবে। চুরি যাবে না!

— বুঝলাম না।

— স্বাভাবিক। এস, বুঝিয়ে বলি।

সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনে গার্ডও হতচকিত হয়ে গেল।

মার্কুইস-এর আমন্ত্রণ মতো শাঁদ্র এলেন মুরিল্লোখানা অপহরণের দিনে।

বিকেল সাড়ে-চারটেয় সংগ্রহশালায় এসে দেখলেন, মার্কুইস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একজন টুরিস্টকে ছবিগুলো দেখাচ্ছেন। শাঁদ্র এগিয়ে আসতেই মার্কুইস্ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ফরাসী ভাষায় টুরিস্ট ভদ্রলোককে বললেন, ইনিই মসিয়োঁ কস্টেলো — এই সংগ্রহশালার অ্যাসিস্টেট কিউরেটার; কিন্তু উনি ফরাসী ভাষা বোঝেন না। শুধু স্প্যানিশ ভাষাটা জানেন।

টুরিস্ট ভদ্রলোক শাঁদ্রর সঙ্গে করমর্দন করে মার্কুইস্‌কে নিম্নকণ্ঠে ফরাসী ভাষাতে প্রশ্ন করলেন, ইনি কি ভিতরের ব্যাপারটা জানেন?

— জানেন। কাল যখন আবিষ্কৃত হবে অরিজিনাল মুরিল্লোখানা খোয়া গেছে তখন উনিই সামাল দেবেন। এইসব কারণেই ছয় হাজার ডলার দাম পড়ে যাচ্ছে।

— উনি ফরাসী ভাষা একটুও বোঝেন না?

— বিলকুল না! ফরাসী আর গ্রীক ওঁর কাছে সমপর্যায়ের।

— হারামজাদাটা এভাবে কত ছবি পাচার করেছে?

জন্মসূত্রে ফরাসী শাঁদ্রর ইচ্ছা হল জবাবে বলেন, তোমার মত হারামজাদা টুরিস্ট যতবার এসেছে!—কিন্তু বলতে পারলেন না; কারণ পরিকল্পনা মতো তিনি ওর কথা বুঝতে না-পারার অভিনয় করছেন। নাট্যকারের নির্দেশ মোতাবেক উনি জানেন শুধু স্প্যানিশ!

মার্কুইস বললেন, এবার আসুন স্যার, আমরা তের-নম্বর ঘরে যাই।

তের-নম্বর 'হল'-এই আছে সেই মুরিল্লোখানা। ছোট্ট ছবি—দশ ইঞ্চি বাই ষোল ইঞ্চি। ওঁরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সে ঘরে পাঁচ-সাতজন দর্শনার্থী। টুরিস্ট ভদ্রলোক মুরিল্লোখানা খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। মার্কুইস বুঝতে পারেন তার উদ্দেশ্য—ছবির প্রতিটি রেখা, প্রতিটি রঙ, মুরিল্লোর স্বাক্ষর, এমনকি চুলফাটের দাগগুলো পর্যন্ত সে স্মৃতিপটে এঁকে নিচ্ছে, যাতে

ঐ ছবিখানা হাতে পেলে সে সমঝে নিতে পারে আসলখানাই সে কিনেছে।

একটু পরেই ঘড়ি দেখে কামরার রক্ষক একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

অর্থাৎ এখন সময় পাঁচটা বাজতে পনেরো। আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই সংগ্রহশালার সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। গার্ড অন্যান্য দর্শনার্থীকে অনুরোধ করল 'হল' ত্যাগ করতে। একে-একে সকলে বেরিয়ে গেলেন। মার্কুইস্-এর কাছে এগিয়ে এসেও স্প্যানিশ ভাষায় বললে, অব্ কৃপাকর নিকাল যাইয়ে সাব!

মার্কুইস বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি।

দ্বারের দিকে একটু এগিয়েই থেমে পড়েন। নাটকের ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রস্থানোদ্যত' ভঙ্গি। এই গার্ডটিই উৎকোচে বশীভূত ওঁর সহকর্মী। অন্য সবাইকে খেদিয়ে নিয়ে দ্বার পর্যন্ত গেল। ব্যূহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় দণ্ডায়মান হয়ে চারদিকে দেখে নিল। এদিকে কেউ আসছে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ইঙ্গিত করল মার্কুইসকে।

ঐন্দ্রজালিকের দ্রুততায় মার্কুইস ছবিখানা পেড়ে নামালেন। এজন্য গার্ডের টুলটার ওপরে উঠে দাঁড়াতে হল তাঁকে। গার্ড নিজেই টুলটা সেখানে রেখে গেছে। ছবিখানা নামিয়ে তিনি উবুড় করে ধরলেন। টুরিস্ট ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পকেট থেকে নিজের কলমটা বার করেছেন। ছবির পিছনে দ্রুতগতিতে একটি স্বাক্ষর করে দেন। পরমুহূর্তেই মার্কুইস ছবিখানা আবার টাঙিয়ে দিলেন স্বস্থানে। দ্বারপ্রান্ত থেকে গার্ড বেশ উচ্চকণ্ঠে হাঁকড় পাড়ে : যাইয়ে সাব; অব্ কৃপা কর বহার যাইয়ে।

ব্যাপারটা কী হল আদৌ বুঝতে পারলেন না শাঁদ্র। পৃষ্ঠদেশে স্বাক্ষর-সমন্বিত অরিজিনাল মুরিল্লোখানাকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হল?

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। বাইরে অপেক্ষা করছিল একটা গাড়ি। মার্কুইস স্বয়ং স্টিয়ারিঙে বসলেন। তাঁর পাশে বসলেন টুরিস্ট খদ্দেরটি। মার্কুইসের ইঙ্গিতে শাঁদ্র উঠে বসেন পিছনের সীটে।

টুরিস্ট ভদ্রলোক মার্কুইসকে ফরাসী ভাষায়—যে-ভাষাটা নাকি পরিকল্পনা মোতাবেক শাঁদ্রর অজানা—প্রশ্ন করলেন, ইস, হারামজাদাটাকে আবার হোটেলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মার্কুইস একগাল হেসে বললেন, কারণ হারামজাদাটি স্বচক্ষে দেখতে চান আপনি আমাকে কত দিচ্ছেন—ছবিটার দাম হিসাবে।

— শালা তো মহা-খচ্চর! পার্টনার-ইন-ক্রাইমকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না!

শাঁদ্র জানলার কাচটা নামিয়ে দিলেন। হাওয়া চাই! কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে তাঁর।

ওঁরা হোটেলে এসে পৌঁছেই বাঁধা-ছাঁদা শুরু করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল ভদ্রলোক আজ রাত্রেই জাহাজে চাপবেন। রাত ন'টা হচ্ছে রিপোর্টিং টাইম। হোটেলে এসে চেক-আউট করার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে করতেই সেই গার্ডটি এসে হাজির। মটোরসাইকেল চেপে। তার হাতে একটা ছোট পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ। ওঁরা চারজনে ফিরে গেলেন হোটেলের ঘরে। দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবার পর সেই গার্ডটি ফোলিও ব্যাগ খুলল। সেটি বিশেষভাবে বানানো। তার ভিতর একটা চোরা-লাইনিং আছে। তা থেকে বার করল একখানা ক্যানভ্যাস। ফ্রেম-ট্রেম নেই। শুধুমাত্র ক্যানভ্যাস। ভদ্রলোক টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালালেন। ছবির পিছনে নিজের স্বাক্ষরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। ছবিটা চিৎ করেও দেখলেন। হ্যাঁ, সেই অরিজিনাল মুরিল্লোখানাই।

নিশ্চিন্ত হয়ে এবার তিনি হিপ্‌পকেট থেকে ভারী ওয়ালেটটা বার করে নোট গুনতে বসেন।
আধঘণ্টা পরে ভদ্রলোককে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে মার্কুইস বললেন, এবার আসুন সেলিব্রেট করা যাক আমাদের পরস্পরের সাফল্য!
শাঁদ্রর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। বললেন, কী বলছেন মশাই! এখন কেটে পড়ার ধান্দা দেখুন। একটি মাত্র রাত হাতে আছে। কাল সকালেই তো ...
— কী? কাল সকালেই কী হবে?
— সংগ্রহশালার দরজা খুললেই সবার নজরে পড়বে মুরিল্লোখানা নেই!
মার্কুইস বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মসিয়োঁ! কাল সকালে কেউ কিছু টের পাবে না! অরিজিনাল ছবিখানা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে ও থাকবে!
— মানে! আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম অরিজিনালখানাই উনি নিয়ে গেলেন!
হো-হো করে হেসে ওঠেন মার্কুইস্। বলেন, না বন্ধু! উনি নিয়ে গেলেন মসিয়োঁ কস্টেলোর আঁকা নকলখানাই। কস্টেলোকে চিনলেন তো? সেই যে হারামজাদাটা ফরাসী হয়েও শুধু স্প্যানিশ ভাষা জানে!
ইন্দ্রজালের গোপন তত্ত্বটা এতক্ষণে বুঝিয়ে দেন :
গার্ডটি গতকাল ডিউটি শেষ হবার পরে শাঁদ্রর আঁকা নকল ছবিখানা অরিজিনালের পিছনে সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিয়েছিল। আসল-নকল দুটি ছবি একই দিকে মুখ ফেরানো! অর্থাৎ ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেক আগে নকল ছবিটার পিছনেই স্বাক্ষর দিয়ে এসেছেন। সেলোটেপের বাঁধন সরিয়ে সেই পেছনের নকল ছবিখানাই গার্ড নিয়ে এসেছে তার মটোরসাইকেলে চেপে!
টুরিস্ট খদ্দেরটিকে দোষ দেওয়া যায় না! সংগ্রহশালায় টাঙানো ছবির পিছনে নিজে হাতে স্বাক্ষর করেছেন, সেই স্বাক্ষর মিলিয়ে নিয়ে তবে দাম মিটিয়েছেন।
তাঁর আর অপরাধ কী?

বিজ্ঞানের সব শাখাতেই যেমন হয় 'প্রতারণা-বিজ্ঞানেও' সেই একই আইন! এই শুনলে অ্যাটম অবিভাজ্য, আলোক সরল-রেখায় চলে; ভাল করে তত্ত্বটা সমঝে নেবার আগেই শোনা গেল—না, অ্যাটমকে ভাঙা যায়, আলোক তরঙ্গপথে চলে! মার্কুইস্ যে অনবদ্য ফর্মূলাটা বার করলেন তাও বেশিদিন ধোপে টিকল না। তা হোক, ঐ ফর্মূলা-মোতাবেক খান দশ-বারো ছবি উনি বিক্রি করেছেন। মার্কুইস্ আর শাঁদ্র বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খুলে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। এক ব্যাঙ্কে বেশি অর্থ আমানত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে সন্দেহের উদ্রেক করে।
বছরখানেক দিব্যি চলল। অপেক্ষাকৃত কম নামী চিত্রকরের ছবি বিক্রি করা কঠিন নয়, কিন্তু নামী চিত্রকরদের সব ছবির হক-হদিস যে আর্ট-কনৌশারদের মুখস্ত। আর্ট-জার্নালে তাদের কথা ছাপা হয়। অধিকাংশ খদ্দেরই অবশ্য অত কিছু খোঁজ রাখে না। তারা বিদেশে এসে দাঁও মেরে ছবি কিনে কেটে পড়তে পারলেই খুশি; কিন্তু মাঝে-মাঝে ওয়াকিবহাল খদ্দেরদের নিয়ে মার্কুইস্ রীতিমত বিপদে পড়ে যান।
যেমন একবার এক টুরিস্ট দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছিল সেই সংগ্রহশালায়। তাকে দেখেই আঁৎকে উঠেছিলেন মার্কুইস্। ভদ্রলোক ওঁকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ব্যাপার কী মশাই? আমি যে ড্যুরারের উড্‌কাটখানা কিনে নিয়ে গেলুম সেখানা সংগ্রহশালায় আবার টাঙানো

হল কী করে? আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নকল ছবি...
—চুপ, চুপ, চুপ! অমন কথা বলবেন না স্যার! শুনুন, আসল ব্যাপারটা। সেই অ্যাসিস্টেন্ট কিউরেটার কস্টেলোকে মনে আছে তো? ব্যাপারটা চাপা দিতে সে একখানা হুবহু নকল বানিয়ে সংগ্রহশালায় টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। চুরি গেছে জানাজানি হলে ওর চাকরি নিয়ে টান পড়বে না ?
— কিন্তু কেমন করে বুঝব যে, এখানাই আসল নয়?
— খুব সহজে। আমি প্রমাণ দেব, আসুন।
একই প্রক্রিয়ায় পাঁচটা বাজতে পনের মিনিটে ঘর খালি হলে সেই গার্ডটি দ্বারমুখে জয়দ্রথের ভূমিকাটা পুনরাভিনয় করল। মার্কুইস্ টুলে উঠে ছবিখানি পেড়ে নামলেন। বললেন, অরিজিনালের পিছনে আপনি নিজে হাতে সই করেছিলেন, নিশ্চয়ই মনে আছে। এবার সেটা খুঁজে বার করুন! খরিদ্দার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নিজের সইটা দেখতে পেলেন না। বললেন, কস্টেলো হারামজাদা তো দারুণ নকল-ছবি বানিয়েছে! আমার কাছে যে অরিজিনালখানা আছে এখানা হুবহু সেইরকম!
— এখন তো বুঝছেন আপনার সঙ্গে কেউ তঞ্চকতা করেনি? এ-সব কথা যেন বাইরের কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না। ভুলে যাবেন না— এখন আপনিও অপরাধের সঙ্গে জড়িত—আন্তর্জাতিক আইন-মোতাবেক আপনাকেও গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। জেল হতে পারে!
— তা তো বটেই। তা তো বটেই!—ভদ্রলোক পালাবার পথ খুঁজে পান না।

আর একবার একখানা 'ভেরমিয়ার' বেচতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হল ওঁকে।
খদ্দের রীতিমতো খলিফা! সে জানে ভেরমিয়ারের মাত্র খান-পনের ছবি বিশ্ব-ললিত কলায় স্বীকৃত। পঞ্চাশ হাজার ডলারে সে যেখানা কিনছে সেটা যে 'অরিজিনাল' তা বুঝে নিতে চাইল। তাই প্রত্যাবর্তনের দিনে সে ছবিখানা কিনতে রাজী হল না। খোদায়-মালুম—সে কী জাতের সন্দেহ করেছে। বললে, ছবিখানা চুরি গেছে জেনে এখানে কী-জাতের প্রতিক্রিয়া হয় তা সে সমঝে নিতে চায়।
— তার 'রিস্কটা' আপনি বুঝতে পারছেন? হয়তো শহরের প্রত্যেকটি বড় বড় হোটেলে খানা তল্লাসী হবে।
— হয়তো কেন? নিশ্চয়ই তা হবে। সে 'রিস্ক' আমার! পঞ্চাশ হাজার ডলার যেখানে 'ইনভল্‌ভড্' সেখানে ঝুঁকিটা তো নিতেই হবে।
মার্কুইস্ বলেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যটা কী? সংগ্রহশালায় টাঙানো ছবির পিছনে নিজে হাতে সই দেবেন—ঠিক পাঁচটায়, আর ছবি ডেলিভারি পাবেন সাড়ে পাঁচটায়! নিজে হাতে করা সইটা মিলিয়েই তো আপনি পেমেন্ট করছেন! নকল ছবির প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে ?
ভদ্রলোক বললেন, সেজন্য নয় মশাই। আমি পরদিন সংবাদপত্রের কিছু কাটিংও সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাই ! বুঝলেন না—অরিজিনাল 'ভেরমিয়ার' তো আমার বৈঠকখানা ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারব না। কেমন করে পেয়েছি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমি ছবিখানা কিনছি, বেচব বলে। পঞ্চাশ হাজারে কিনে একলাখে ঝাড়ব । যে কিনবে তাকে স্থানীয় সংবাদপত্রের কাটিং দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, এখানকার সংগ্রহশালা থেকে সত্যিই ঐ ছবিখানা চুরি

গেছে !

মার্কুইস্‌ও পেছপা হবার পাত্র নন্‌। পঞ্চাশ হাজার ডলার 'ইনভল্‌ভড' ! দলে নিতে হল আরও একজন সহকারীকে। সংগ্রহশালার রেস্টোরেটার। তার কাজ হচ্ছে ছবিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। স্থির হল, সে সোমবারে ছবিখানা ঝাড়া-পোঁছা করার জন্য নামিয়ে নেবে। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যেয় সেটা টাঙাতে ভুলে যাবে। ছবিখানা স্টোররুমের ভল্টে রেখে মঙ্গলবার অনুপস্থিত হবে। ফ্রেঞ্চ লীভে স্টেশান ছেড়ে চলে যাবে । মূল্যবান ছবি প্রতিবার দেওয়াল থেকে নামিয়ে নেবার আগে রেস্টোরেটারকে সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হয়—সেটাই আইন। এক্ষেত্রে আইনটা লঙ্ঘন করতে হবে তাঁকে। উনি রাজী হলেন—পাক্কা দশ হাজার ডলারে!

সেবার রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় খরিদ্দার ভদ্রলোককে স্বাক্ষরিত নকলখানা হস্তান্তরিত করা হল। তারপরেই মূল ছবিটা স্ট্রং-রুমে রেখে রেস্টোরেটার ভদ্রলোক গা-ঢাকা দিলেন। সোমবার সংগ্রহশলা বন্ধ । মঙ্গলবার দারুণ হৈ-চৈ হল, ছবিটা খোয়া যাওয়ার কথা জানাজানি হতে। তলব করতে গিয়ে দেখা গেল রেস্টোরেটার ভেগেছে! বুধবারের স্থানীয় কাগজে ছাপা হল দুঃসংবাদটা। পুলিসে খানাতল্লাসী শুরু করল। খরিদ্দার ভদ্রলোক ঐ বুধবার রাত্রেই সেই কাগজের কাটিং নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে গেলেন। ছবিখানা অবশ্য চুরি ধরা পড়ার অনেক আগেই সীমান্ত অতিক্রম করেছে। বৃহস্পতিবারে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন রেস্টোরেটর ভদ্রলোক। স্বীকার করলেন অপরাধ—মানে কর্তব্যে অবহেলার। তবে ছবি চুরির নয়। সেখানা যথারীতি গচ্ছিত রাখা আছে ওঁর স্ট্রং-রুমে। সে সব খবরও ছাপা হল পরদিন স্থানীয় কাগজে—কিন্তু ততক্ষণে সেই খরিদ্দার ভদ্রলোকের জাহাজ অতলান্তিকে। স্থানীয় সংবাদপত্রের কপি তাঁর হাতে আর কোনদিনই পৌঁছয়নি। কিংবা কে জানে, হয়তো পরে জানতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু কৈফিয়ৎ দাবী করতে ফিরে আসার হিম্মৎ তাঁর ছিল না। কারণ জানতেন—এ জাতীয় কারবারে কৈফিয়ৎ দাবী করতে বেগানা ফিরে যাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে খুনখারাপির ঝুঁকি নিতে হয়!

এসব দুর্ঘটনার মোকাবিলা করেছিলেন মার্কুইস্‌। তাঁকে পদ্ধতিটা বদলাতে হল অন্য কারণে। একটি আন্তর্জাতিক আর্ট-জার্নালে পড়লেন—লিসবনে একটি অরিজিনাল রেম্‌ব্রাণ্ট বিক্রি করতে গিয়ে এক প্রতারক ধরা পড়েছে। জানা গেছে সেটি নকল, তার পিছনে একটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। অরিজিনালখানা আছে রায়ো-ডি-জেনিরোর সংগ্রহশালায়। গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা শুরু হল অতঃপর।

সহযোগী গার্ডটি এসে মার্কুইসকে গোপনে সংবাদ দিয়ে গেল—পালে বাঘ পড়েছে! শাঁদ্র আর মার্কুইস নীরবে তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে বুইনস্‌ এয়ার্সে ফিরে গেলেন।এবার কী করতে চান' অন্য কোনও সংগ্রহশালায় নতুন করে ব্যবসা খুলবেন ? — জানতে চাইলেন শাঁদ্র।

বেশ বোঝা যায় তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—চিত্রকর থেকে প্রবঞ্চক!

মার্কুইস বললেন, না। আমি পদ্ধতিটাই বদ্‌লে নিতে চাই। বুঝলেন না, এই গোয়েন্দা-পুলিসগুলো মহা হারামজাদা। যেমনি সেয়ানা তেমনি ফিচেল। ওরা এতদিনে বোধহয় আমার কায়দাটা বুঝে ফেলেছে — ঐ ছবিটার পিছনে অজ্ঞাত ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখে। হয়তো ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে সেলোটেপের অস্তিত্বও বুঝে ফেলেছে। দুই আর দুই-এ চার হিসাবে হয়ত আন্দাজ করেছে কীভাবে নকল ছবিখানা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপের বাজারে গেছে। আমার বিশ্বাস—ওরা

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ফাঁদ পেতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

— বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকাতেই কেন ?

— যেহেতু লিসবনের সেই চোরাই ছবির অরিজিনালটি রায়ো-ডি-জেনিরোতে ছিল এবং আছে।

— তাহলে কি আমরা মার্কিন-মুলুকে সরে যাব ?

— না! শোন শাঁদ্র! এবার একটা বড় জাতের দাঁও মারতে হবে; যাকে বলে 'মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার' ! এমন একটা বড় জাতের অপারেশন করতে হবে; যার পর বাকী জীবন তোমাকে-আমাকে আর এ ধাষ্টামোর মধ্যে না যেতে হয়!

— সেটা কী রকম ?

— ধর একটা ডীলে আমরা তিন লাখ ডলার পেলাম—তুমি এক লাখ, আমি দু-লাখ!

— তিন লাখ ডলার একখানা ছবি থেকে! আপনি কি বত্তিচেল্লির 'প্রিমেভেরা' অথবা রেম্‌ব্রাণ্টের 'নাইটওয়াচ'-এর কথা ভাবছেন ?

— না। তাতে দু-জাতের অসুবিধে। প্রথম কথা—দু-খানাই প্রকাণ্ড মাপের! বগলদাবা করে পাচার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত ও দুখানাই ফ্রান্সে নেই। তুমি-আমি দুজনেই ফ্রেঞ্চ ভালরকম ভাবে জানি। আমার পরবর্তী লক্ষ্যস্থল পারী। আরও সূচীমুখ করে বলতে পারি : ল্যুভার।

—ল্যুভার! কোন খানা ?

— লেঅনার্দোর 'মোনালিসা' !

শাঁদ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বারকয়েক কক্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পায়চারি করে ফিরে এসে বলে, আপনি বদ্ধ উন্মাদ!

— উন্মাদ! কেন পাগলামির কী দেখলে এতে ?

—পাগলামি নয় ? ল্যুভার থেকে 'মোনালিসা' ছবিখানা চুরি করা অসম্ভব!

— চুরি তো করব না! তুমি আঁকবে, আর সেই নকলখানাই বেচব আমি!

— আপনি গোড়ায়-গলদ করছেন। লুভ্যার থেকে 'মোনালিসা' চুরি গেছে কিনা এখবর একটা ওয়ার্ল্ড নিউজ! পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোনো মানুষ যদি খবরের কাগজ পড়বার মতো বিদ্যের অধিকারী হয় তবে সে খবর জানবেই! 'কস্টেলো একখানা নকল এঁকেছে, আর ল্যুভার মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ সেখানাই টাঙিয়ে রেখেছেন' - এ-কথা আপনি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না তাছাড়া ল্যুভারে যারা পাহারা দেয় তারা কোনও খদ্দেরকে ছবির পিছনে সই করতে দেবে না। লক্ষ ডলার পেলেও নয়! তৃতীয়তঃ ....

মার্কুইস ধমক দিয়ে ওঠেন, ওসব ছেঁদো কথা বাদ দাও শাঁদ্র! আমার ওপর নির্ভর কর। সোজা কথায় আমার প্রশ্নের জবাব দাও : 'মোনালিসা'র হুবহু নকল আঁকতে পারার হিম্মৎ তোমার আছে ? এমন একখানা নকল যা পরীক্ষা করে বোঝা যাবে না ?

—তা আছে। যদি তার জন্য লক্ষ-ডলার মজুরি পাই। কিন্তু...

— কিন্তু-টিন্তুর কথা ছাড়। ল্যুভারে বসে 'সেভেন-এইট্‌থ্‌-স্কেলে' ছবিখানা আঁকতে তোমার কতদিন লাগবে ?

শাঁদ্র একটু ভেবে নিয়ে বললে, ধরুন তিন মাস!

— ঠিক আছে। আর সেই ছবি দেখে ঘরে বসে 'ফুলস্কেলে' দ্বিতীয়বার আঁকতে ?

— আরও ছয় মাস!

— তা হলে তুমি তৈরী হয়ে নাও। শোন শাঁদ্র! সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার, সমস্ত 'রিস্ক' আমার। আর সমস্ত টেক্‌নিক্যালিটি তোমার। লাভের অংশ বরাবর যেমন ছিল তাই, অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগ তোমার, দুভাগ আমার। রাজী?

— রাজী। যদি আমাকে বেআইনি কাজের কোনও রকম ঝুঁকি নিতে না হয়।

— হবে না। তুমি তৈরী হয়ে নাও। নেক্সট স্টিমারে পারী রওনা হয়ে যাও। সবাই জানবে সাউথ আমেরিকায় ঘুরে তুমি বেশ কিছু ছবি বিক্রি করে দেশে ফিরে এসেছ। সাবেক প্রফেশানেই। অর্থাৎ ল্যুভারে বসে ছবি আঁকা। ঘটনাচক্রে তুমি ছোট স্কেলে 'মোনালিসা'খানাই আঁকছ। ছবিখানা শেষ হলে তুমি এখানে ফিরে আসবে। আমি চারশ বছরের পুরানো ক্যানভাস তোমাকে সাপ্লাই করব। তাতে ফুল-স্কেলে ছবিখানা দ্বিতীয়বার এঁকে—ঐ তোমার কীসব চুল-ফাটের কায়দা-মায়দা আছে সব সেরে আমাকে পারীতে টেলিগ্রাম করবে 'মেশিন সাক্‌সেসফুলি ইনস্টলড্'! আমি তখন এখানে ফিরে আসব। ছবিখানা বেচব! বুঝতে পারলে?

— আদৌ নয়! আসল 'মোনালিসা' ল্যুভারে ঝোলানো থাকবে আর আপনি এখানে এসে নকলখানা কেমন করে বেচবেন?

এবার মার্কুইস নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে বারকতক পদচারণা করে ফিরে এসে আবার বসে পড়েন। বলেন, লুক হিয়ার শাঁদ্র। কী ভাবে কী হবে সেসব তোমার জেনে কাজ নেই। সেসব তোমার পক্ষে না-জানাই মঙ্গল। তুমি শুধু আমার অর্ডার মোতাবেক কাজ করে যেও আর কাজ হাঁসিল হলে আমার উপার্জনের খরচা-খরচা-বাদে লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ বুঝে নিও!

শাঁদ্র বেঁকে বসল। বললে, শুনুন স্যার! এতদিন তাই হয়েছে—কিন্তু এবার তাতে আমি রাজী নই। এটা রীতিমতো বিগ ডীল—বলতে গেলে এ শতাব্দীর হয়তো 'বিগেস্ট-ডীল'—মানে চোরাই শিল্প পাচারের ইতিহাসে। হয় আপনি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলুন, নয় আমাকে বাদ দিয়ে কাজটা হাঁসিল করুন।

মার্কুইস বললেন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলে এতবড় 'রিস্ক' নিতাম না। আমার মনে হচ্ছিল—সব কথা বিস্তারিত না জানাই তোমার পক্ষে মঙ্গল। যা হোক, তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বলি। আজ থেকে এক বছর পরে যেমন করেই হোক ল্যুভার সংগ্রহশালা থেকে 'মোনালিসা' ছবিখানা চুরি যাবে। মানে তারিখ আমি নির্ধারণ করব তোমার টেলিগ্রাম পেলে। আমেরিকায় 'মেশিনটা ইনস্টলড্' হয়েছে জানার পর। তুমি ঠিকই বলেছ, পারীর সব ক'টা কাগজে পরদিন হেড-লাইন নিউজ ছাপা হবে; ক্রমে তা সারা পৃথিবীতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ছবিটা যে চুরি গেছে এ বিষয়ে যখন কারো কোনও সন্দেহ থাকবে না তখনই আমেরিকায় বসে আমি নকল ছবিটা বেচব। সেখানা বিক্রি হয়ে গেলে ফরাসি সরকার আসল ছবিখানা ফিরে পাবে। যে নকলখানা কিনেছে সে তখন হাত কামড়াবে। এবার বুঝলে?

— সবটা নয়। কীভাবে 'মোনালিসা' চুরি যাবে সে প্রশ্ন আমি আদৌ তুলছি না। আমি ভাবছি অন্য একটি প্রশ্ন : কে ওখানা কিনবে? খদ্দের পাবেন কী করে? ওটা কোন্ মূর্খ কিনবে? কিন্‌লেও তো তাকে সারা জীবন সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে। কারণ...

— হেতুটা বিস্তারিত বলা বাহুল্য। কিন্তু এসব কথা—আবার বলছি—তোমার না শোনাই

মঙ্গল। শুনতে চাও?

— চাই। আমার দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছে জানতে।

— তবে শোন। শিল্পদ্রব্যের আন্তর্জাতিক চোরা-কারবারের দু-তিনটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান আছে। তারা লক্ষ ডলারের নিচে কেনাবেচা করে না। আমার মাথায় আইডিয়াটা আসার পর আমি তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। একজন জানিয়েছেন—হ্যাঁ, 'মোনালিসা' ছবিখানা যদি ল্যুভার থেকে চুরি যায় তবে সেখানা কিনবার মতো খদ্দের তাঁর হাতে আছে। আনুমানিক তিন লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যে। তুমি জানতে চাইলে ক্রেতা সেখানা নিয়ে কী করবে—তাই নয়? তার জবাব হচ্ছে : সেখানা ফরাসী সরকারকে প্রত্যর্পণ করবে!

— তাজ্জব! তার মানে?

— ক্রেতা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার। ফরাসী সরকারের সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কয়েক শত কোটি ডলারের ডীল। বুঝতেই পারছ—মোনালিসা চুরি যাওয়ায় ফরাসী সরকার বিশ্বের কাছে অপদস্থ হয়ে পড়বে। ছবিখানা অবিলম্বে উদ্ধার করতে না পারলে হয়তো আগামী নির্বাচনে বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে। তাই ছবিখানা ফেরত পাওয়ার জন্য ওদের অপরিসীম আগ্রহ। আমার ছবির ক্রেতা সেই সুযোগটি নিতে চান। তিন লক্ষ ডলারে আমার কাছে কিনে তিনি গোপনে সেটি ফরাসী সরকারকে উপহার দেবেন। গোপনে এ জন্য যে, কৃতিত্বটা তিনি ফরাসী সরকারকেই অর্পণ করতে চান। যেন তারা নিজেরাই ছবিটা উদ্ধার করেছেন। নির্বাচনের আগে এটা করতে পারলে সরকার অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ক্রেতার স্বার্থে ঐ বাণিজ্যিক চুক্তি করতে ফ্রান্স বস্তুত বাধ্য হবে। বুঝলে?

শাঁদ্র স্বীকার করলেন—আদ্যন্ত পরিকল্পনাটা তাঁর বোধগম্য হয়েছে। এবার তিনি অন্য একটি প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনিও আমার সঙ্গে একই স্টিমারে পারী যাচ্ছেন না কেন? আপনাকে তো ছবিটি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে আপনার কী কাজ?

— না। একই জাহাজে আমরা যাব না। আমি যাব নেক্সট স্টিমারে। ছদ্মনামে। ছদ্ম-পাসপোর্টে। মার্কুইস ওয়ালফিয়েনোকে আজ থেকে তুমি চেন না। আমিও চিনি না!

— তার কী প্রয়োজন?

— সেটা তুমি বুঝবে না। বুঝলে, ভগবান তোমাকে যে অঙ্কন-প্রতিভা দিয়েছেন তাতে তুমি লাভের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে খুশি থাকতে না। বুঝলে না? এক বছর পরে যে অপরাধটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাকে তার জন্য এখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। 'মোনালিসা' অপহরণের সঙ্গে কোন সূত্রেই যেন মার্কুইস এদুয়ার্দো দ্য ওয়ালফিয়েনোর নামটা যুক্ত করা না যায় সে ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে।

প্রায় তিন মাস পরে পারীর সেন্ট্রাল স্টেশনে একটি দিন। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। পারীর রাস্তায় ছাতার মিছিল। শাঁদ্র আজ আর ল্যুভারে ছবি আঁকতে যেতে পারেননি। দিন কয়েক আগেই অতলান্তিকের ওপার থেকে একটি তারবার্তায় জেনেছেন সিনর আলবার্তো গঞ্জালেস্ লন্ডন ঘুরে ট্রেন-যোগে পারীতে এসে পৌঁছবেন আজ। সেই মর্মে সিনর গঞ্জালেস্-এর নামে একটি পাঁচতারা হোটেলে বিলাসবহুল স্যুইট বুক করে স্টেশানে এসেছেন তাঁকে রিসিত করতে। ঠিক সময়েই ক্যালে-পারী এক্সপ্রেসটা স্টেশানে এসে পৌঁছালো।

শাঁদ্র প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মার্কুইস-এর জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাশাপাশি

তিনখান ফার্স্ট ক্লাস কামরা। যাত্রীরা সকলেই নেমে পড়লেন।

আশ্চর্য!

মার্কুইস আসেননি। সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পেছন ফিরতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন পোর্টম্যান্টো ব্যাগ হাতে। হেসে বললেন, সুপ্রভাত মসিয়োঁ শার্দ্র! আমাকে চিনতে পারেননি। নয়?

তাজ্জব! কণ্ঠস্বরে ওঁকে সনাক্ত করা গেল। চেহারা দেখে নয়।

মার্কুইস-এর ছিল নিপাট কামানো মুখ, চোখে কালো চশমা। এঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সূচালো গোঁফ, চোখে প্যাশ্‌নে। শার্দ্র ঢোক গিলে বললেন, সুপ্রভাত মসিয়োঁ গঞ্জালেস। না! অনেকদিন পরে দেখছি তো, তাই প্রথমটায়...

বাধা দিয়ে মার্কুইস বললেন, আমাকে শুধু 'সিনর' বলে উল্লেখ করবেন। পুরো নাম উচ্চারণের কী দরকার? সিনর তো যে কোনও লোকের অভিধা। চলুন, যাওয়া যাক! উঃ কী বৃষ্টিটাই না নেমেছে!

হোটেলের রেজিস্টারে গঞ্জালেসের সই দিয়ে মার্কুইস উঠে এলেন নিজের ঘরে। অর্গলবদ্ধ ঘরের নির্জনতায় বললেন, শোন শার্দ্র, একখানা নয়, তোমাকে দুখানা 'মোনালিসা' আঁকতে হবে। আরও একটি খরিদ্দার জোগাড় হয়েছে ইতিমধ্যে। শার্দ্র ভিজে ওভারকোটটা সংলগ্ন বাথরুমে টাঙিয়ে ফিরে এসে বলেন, সিনর! আমি দুঃখিত! আপনাকে পরিকল্পনাটা পাল্টাতে হবে!

— পাল্টাতে হবে! কেন? কী এমন ঘটল ইতিমধ্যে?

— ল্যুভার গেলেই দেখতে পাবেন! এই কয়েক বছরে মধ্যে পারীতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে! লা জ্যকোন্ডা ছবিখানা এখন বুলেট-প্রুফ কাচের ফ্রেমে সুরক্ষিত!

— বুলেট-প্রুফ কাচের ফ্রেম! তার মানে?

শার্দ্র আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা মেলে ধরেন :

গত বৎসর, অর্থাৎ উনিশ' শ দশ সালে ল্যুভারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। জনৈক মদ্যপ দর্শক একটি মহিলার পোর্ট্রেটে একটি ছোরা বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়। সকলে ধরে ফেলায় ছবিটা কোনক্রমে বাঁচে। ছবিখানায় সে নাকি তার বিশ্বাসহন্তা প্রেমিকার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিল। তারপর অনেক অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। ল্যুভারের ডিরেক্টারবর্গ সিদ্ধান্ত নেন যে, অতি বিখ্যাত শিল্পসম্ভারগুলিকে বুলেট-প্রুফ কাচের আবরণে সুরক্ষিত করতে হবে। তাতে বহু প্রতিবাদধ্বনি ওঠে। কাচের ভিতর দিয়ে শিল্পসম্পদ নাকি ভাল ভাবে দেখা যাবে না। তার সৌন্দর্যহানি অনিবার্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিবাদেই কর্ণপাত করেননি। স্থির হয়েছে প্রতি বৎসর পাঁচ-দশখানি করে ছবি ঐভাবে কাচের আবরণে সুরক্ষিত করতে হবে। প্রথম ব্যাচের মধ্যেই প্রত্যাশিত ভাবে ছিল : 'মোনালিসা'।

বর্তমানে 'লা জ্যকোন্ডা' ঐ বজ্রবাঁধুনি কাচের দুর্গে সুরক্ষিত!

মার্কুইস গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, যা হোক, তোমার ছবি কত দূর? ছোট স্কেলে যে ছবিখানা আঁকছ?

— আমি 'মোনালিসা' আদৌ আঁকছি না। ওটা অপসারণ করা অসম্ভব বুঝে আমি অন্য একখানি ছবি...

মার্কুইস উত্তেজিত হয়ে বলেন, এই জন্যেই সেদিন তোমাকে সব কথা বলতে চাইনি! এসব

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কে বলেছে তোমাকে? তুমি হুকুম পেয়েছ, তামিল করে যাবে। আমি কীভাবে কী করব তা তুমি ভাবতে বসলে কেন?

— আপনি এখনো ঐ ছবিখানার কথাই ভাবতে পারছেন?

— নিশ্চয়ই! কী ভাবে এ বাধা অতিক্রম করব তা জানি না, কিন্তু করতেই হবে।

— কিন্তু কেন? তার চেয়ে যেসব ছবি সুরক্ষিত করা হয়নি তার কোন একটা...

— তা হয় না!

— কেন হবে না? আপনি ইচ্ছে করলেই তো তা হতে পারে?

— পারে না শার্দ্র, পারে না! একটি মাত্র কারণে। আমি আর কোনও ছবির কথা চিন্তাই করতে পারছি না! আমার একান্ত প্রেম একমুখী! আমি যে আকণ্ঠ ডুবে আছি মোনালিসার প্রেমে!

পারীর অন্যতম প্রধান রাজপথ সাঁজেঁ লিজঁ-র ওপর গোবিয়ার কোম্পানির শো-রুম। প্রকাণ্ড বড়। গোবিয়ার গ্লেজিয়ার প্রাইভেট কোম্পানি। 'বুলেট প্রুফ' কাচ তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পেটেন্ট নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে বসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালা থেকে ক্রমাগত ওঁরা অর্ডার পান—অত্যন্ত মূল্যবান শিল্পসামগ্রীকে বুলেট-প্রুফ আস্তরণে সুরক্ষিত করার এন্তেজামে। রোমের ভ্যাটিকানে, ফ্লোরেন্সের উফিজিতে, আমস্টার্ডামের রাইখ্‌ মুজিয়ামে ওঁরা কর্মী পাঠিয়ে অনেক মহামূল্যবান শিল্পসামগ্রীকে সুরক্ষিত করেছেন। এমনকি অতলান্তিকের ওপার থেকেও—নিউ ইয়র্ক, লস্‌ অ্যাঞ্জেলেস্‌, শিকাগো থেকেও অর্ডার আসছে।

সকাল দশটা। অ্যাভিন্যু পথটি সীন নদীর সমান্তরালে। এখন শহর জাগছে। গতকাল সন্ধ্যায় এই নদীতীরের কুঞ্জ-বিতানে জোড়ায়-জোড়ায় যে তরুণ-তরুণীর দল পারীর সন্ধ্যা উপভোগ করে গেছে এখন তাদের স্মৃতি যেন স্বপ্নকথা। এখন এ পথ দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছোটাছুটি করছে অফিসগামী যাত্রীর দল। হাতে ছাতা, এবং পোর্টম্যান্টো। মাঝে-মাঝে দু-একটি ল্যান্ডো অথবা হ্যানসম। পারীর রাস্তায় মোটরগাড়ি তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ।

একটি হ্যাকনি ক্যারেজ দাঁড়ালো গোবিয়ার কোম্পানির গাড়ি-বারান্দার নিচে! নেমে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গায়ে ওভারকোট, মাথায় বাউলার টপ-হ্যাট, হাতে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা একটা সৌখিন ছড়ি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি — অষ্টম এডওয়ার্ডের ঢঙে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে রিসেপ্‌শনিস্ট-এর কাছে নিজের ভিজিটিং কার্ডখানি দাখিল করে জানতে চাইলেন, আন-অ্যাপয়েন্টেড এসেছি, মসিয়োঁ পন্তিফ্‌ কি পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন?

রিসেপ্‌শনিস্ট ওঁকে বসতে বললে। ওঁর কার্ডখানির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। সাক্ষাৎপ্রার্থী ইংরাজ। নাম : ডঃ স্যামুয়েল রিচার্ডসন। ঠিকানা লন্ডনের। কিন্তু নামের পরে তিনটি ক্যাপিটাল অক্ষরে বোঝা যায় উনি রয়্যাল আর্ট সোসাইটির ফেলো। ধুরন্ধর শিল্পবোদ্ধা। মেয়েটি বাও করে বললে, একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমি দেখছি কী করতে পারি।

অচিরেই ভিতর থেকে ডাক এল বৃদ্ধের।

গোবিয়ার গ্লেজিয়ার ফার্মের সিনিয়র পার্টনার মসিয়োঁ পন্তিফ্‌ মধ্যবয়সী। সাদরে তিনি আহ্বান করলেন ডক্টর রিচার্ডসনকে। বললেন, বসুন স্যার, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি বলুন? টুপিটা অভিবাদনের জন্য খুলেছিলেন, সেটা কোলের ওপর নিয়ে ডক্টর রিচার্ডসন ভিজিটার্স

চেয়ারে বসলেন। বললেন, আমার ভিজিটিং কার্ডে লন্ডনের ঠিকানা আছে বটে কিন্তু আজ তিন বছর আমি আছি ভারতবর্ষে। ইন্ডিয়াতে রাজস্থান বলে একটা অঞ্চল আছে—নাম শুনেছেন?

— শুনেছি! টডস্ রাজস্থান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানে আছে অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য। ব্রিটিশ প্যারামাউন্সির অধীনে করদ রাজ্য। আমি বর্তমানে তারই একটি রাজার সংগ্রহশালার কিউরেটার। বস্তুতঃ রাজস্থানী আর গুজরাটী পট চিত্রের ওপর একটি গবেষণা করব বলেই ঐ চাকরিটা নিয়েছি। আর মাসছয়েক থাকতে হবে। হোমে যাচ্ছিলাম, পারীতে দু-দিন থাকব। ভ্যাটিকানে আপনাদের কাজ দেখে একটা আইডিয়া মাথায় এল। তাই একটি প্রস্তাব নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম।

— বলুন স্যার?

বৃদ্ধ আদ্যোপান্ত খুলে বললেন সব কথা।

উনি যে রাজার আশ্রিত তাঁর দরবারে, সিংহাসনের পিছনে টাঙানো আছে একটি সিল্কের স্ক্রোল। মহারাজার এক পূর্বপুরুষ গত শতাব্দীতে সেটি তিব্বত থেকে নিয়ে আসেন। তিব্বতের কোন মঠাধ্যক্ষ লামা নাকি সেটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তারপর ছয়-দশক ধরে সেটি দরবার-কক্ষে শোভা পাচ্ছে। ওঁদের ধারণা সেটা একটা রাক্ষসের ছবি। বাস্তবে তা নবম-শতকে অঙ্কিত এক 'লাফিং-বুদ্ধা'! ডক্টর রিচার্ডসনের মতে সেটি একটি অমূল্য শিল্পসম্পদ। তাঁর আহ্বানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান মেজর-জেনারেল কানিংহ্যাম সাহেব এসে ঐ রেশমের ওপর আঁকা ছবিটি পরীক্ষা করে বলেছেন, তার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ রূপেয়া!

— রূপেয়া? মানে?

— ভারতীয় মুদ্রা। ধরুন লক্ষ ফ্রাঁ! কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর ওটি অপহরণের প্রচেষ্টা হয়। এদিকে রাজা কিছু 'সুপারস্টিশাস্'—ঐ রাক্ষসমূর্তিটি দরবার-কক্ষ থেকে অপসারিত করলে নাকি তাঁর ওপর দেবতার কোপ পড়বে! এখন ডক্টর রিচার্ডসনের প্রস্তাব—গোবিয়ার-কোম্পানির তরফে কোনও কর্মী কি ভারতবর্ষে গিয়ে ঐ স্ক্রোলটি দরবারের দেওয়ালে বুলেট-প্রুফ কাচ দিয়ে সংরক্ষিত করে আসতে পারে?

— ছবিটি কত বড়?

— ত্রিশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি।

— মাপ করবেন। সেন্টিমিটারের হিসাবে বলুন।

বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, তা বটে। আমি ভুলে গেছি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে আছি। ধরুন পঁচাত্তর সে.মি. বাই পঞ্চাশ সে.মি.।

মসিয়োঁ পন্তিফ্ বললেন, কিন্তু খরচ যে অনেক পড়ে যাবে, ডক্টর!

— তা তো পড়বেই। আপনাদের ন্যায্য দাবীর ওপর আমি একজন কর্মীর যাতায়াতের খরচ দেব। এখানে সে যা মজুরি পায় তার দেড়গুণ মজুরি দেব। এক্ষেত্রে এমন কোন এক্সপার্ট কর্মী কি ফোকটে ভারতবর্ষটা বেড়িয়ে আসতে রাজি হবে না?

পন্তিফ্ বললেন, হবে। আমার দুজন এক্সপার্ট কর্মীর কথা মনে আসছে। কিন্তু তাদের একজন ছাপোষা প্রৌঢ় মানুষ। হয়তো বউ-ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে চার-ছয় মাসের জন্য বিদেশে যেতে রাজি হবে না। দ্বিতীয়জন অল্পবয়সী, ব্যাচিলার। একজন ইতালিয়ান। ল্যুভারের যাবতীয় কাজ সেই করেছে। আমি তাকেই বাজিয়ে দেখি।

— দেখুন। কিন্তু আমি তো আগামীকালই পারী ত্যাগ করে যাব। তাকে আজই...

— দেখছি।

পন্তিফ্ একজন সহকর্মীকে বললেন, ভিন্স্ আজ কোথায় কাজ করছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখত।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে ভিন্সেন্জো পেরুগিয়া অফিসেই উপস্থিত ছিল। বড় সাহেবের আহ্বান পেয়ে সে দেখা করতে এল।

বছর ত্রিশ বয়স। একহারা ছিপছিপে চেহারা। একটু বোকা-বোকা চাহনি।

— আপনি আমাকে ডাকছিলেন স্যার?

— হ্যাঁ। শোন। তোমাকে একটা কাজে আমরা ভারতবর্ষে পাঠাতে চাই। মজুরি যা পাচ্ছ তার দেড়গুণ পাবে। যাতায়াতের খরচ আমাদের। ফিরে আসতে মাস ছয়েক দেরী হবে। তুমি যেতে রাজী আছ? ইনিই সব খরচ দেবেন।

লোকটার গলকণ্ঠ বার-কয়েক ওঠা-নামা করল। ভাল করে আগন্তুককে দেখে নিল। তারপর সে একটি সঙ্গত প্রশ্ন করল, যাতায়াতে জাহাজে আমার যে দেড় দু'মাস সময় লাগবে তখন তো আমি বেকার?

ডক্টর রিচার্ডসন বললেন, নিশ্চয়ই নয়। সাবাথ-ডে বাদে পারী ত্যাগ করা থেকে ফিরে আসার দিনটি পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাকে দেড়া-মজুরি দেওয়া হবে। এছাড়া যাতায়াতের এবং থাকা খাওয়ার যাবতীয় রাহাখরচ।

আবার গলকণ্ঠটা ওঠা-নামা করল। লোকটা বলল, আমাকে কিছু অগ্রিম দিতে হবে তাহলে। আমি জামা-কাপড় বানাবো!

রিচার্ডসন বললেন, নিশ্চয়! এখনই দিয়ে যাচ্ছি। লন্ডন থেকে আমি ফিরে আসব ঠিক একমাস পরে। ইতিমধ্যে তুমি তৈরী হয়ে থাক।

ওভারকোটের ভিতরের পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করে ডক্টর রিচার্ডসন জানতে চাইলেন, এখানে তুমি দৈনিক কত করে মজুরি পাও?

— তিন ফ্রাঁ।

— ঠিক আছে। আমার কাছে সাড়ে-চার ফ্রাঁ পাবে দৈনিক। আর এই ধর তিনশ ফ্রাঁ অগ্রিম। জামা-কাপড়, সুটকেস ইত্যাদি কিনে তৈরী হয়ে থেক।

এতক্ষণে লোকটা হাসল।

ডক্টর রিচার্ডসন মসিয়োঁ পন্তিফ্কে বললেন, লন্ডন থেকে ফেরার পর আপনার সঙ্গে অন্যান্য কথা হবে। বুলেট-প্রুফ কাচ, ফ্রেম বা অন্যান্য যার মূল্য আমার দেয় তা মিটিয়ে দিয়ে যাব। আজ উঠি তাহলে।

করমর্দন করে উনি দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ওঁর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেছে। বললেন, মসিয়োঁ পন্তিফ্, আপনি কি ওবেলার জন্য পেরুগিয়াকে ছুটি দিতে পারেন?

— কেন বলুন তো?

— আমি যে ঘরখানা ভাড়া নিয়েছি তার জানলার একখানা কাচ ভাঙা। কাল রাত্রে শীতে কষ্ট পেয়েছি। আপনি অনুমতি দিলে মসিয়োঁ পেরুগিয়া আজ বিকালে একখানা কাচ আমার ঘরে লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

— এ আর এমন শক্ত কথা কি ?

ডক্টর রিচার্ডসন তাঁর সাময়িক আবাসের ঠিকানা লিখে কাগজখানা ঐ ইতালিয়ান ছোকরার হাতে দিলেন। বললেন, বিকেল তিনটে নাগাদ আমি তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করব। কাচ তুমি নিয়ে যেও। আন্দাজ দশ ইঞ্চি বাই...আই মীন, ত্রিশ সেন্টিমিটার বাই বিশ সেন্টিমিটার।

লোকটা আবার একগাল হাসল।

ঐদিনই বেলা এগারোটা।

শার্দ্র তার রঙ তুলি গুছিয়ে নিয়ে তৈরী। মার্কুইস্ ওকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। না হলে সে ন'টার মধ্যেই সচরাচর ল্যুভারে চলে যায়। সমস্তদিন ধরে আঁকে। আঁকে : মোনালিসা। উপায় কী ? মার্কুইসের প্রেম যে একমুখী !

ডোর বেল বাজল। শার্দ্র উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরে এলেন মার্কুইস। বললেন, শোন শার্দ্র। আজ সন্ধ্যায় তুমি এঘরে হুট করে এসে পড়ো না। সন্ধ্যায় কোনও অপেরা হাউসে ঢুকে পড়। রাত ন'টা পর্যন্ত তোমার কাছে এই ঘরখানা আউট অফ্ বাউন্ডস্ ! বুঝলে ?

— কী ব্যাপার ?

— ব্যাপার কিছুই নয়। তোমার ঘরে ঐ পুবের জানলার ভাঙা কাচটা মেরামত করতে একজন মিস্ত্রি আসবে। আমি চাই না তোমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে যাক। তুমিও তাকে দেখবে না। সেও তোমাকে দেখবে না।

— জানলার কাচ ! কোনও জানলার কাচ তো ভাঙা নেই এ-ঘরে।

মার্কুইস নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছিলেন। ছদ্ম বিরক্তি দেখিয়ে বলেন, আঃ ! বড় তর্ক কর তুমি ! ঐ কাচখানা ভাঙা নয় ?

শার্দ্র অবাক হয়ে বললে, কোন্‌খানা ?

মার্কুইস তাঁর হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছড়িটা তুলে নিয়ে জানলার কাচে সজোরে আঘাত করে বললেন, এইখানা !

ঝন্ ঝন্ করে কাচটা শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে !

লোকটার সময়-জ্ঞান আছে। বিকেলবেলা ঠিক তিনটের সময় শার্দ্রর সদর দরজায় কল-বেল বেজে উঠল। শার্দ্র ততক্ষণে ল্যুভারে বসে মোনালিসা মক্‌সো করছে। মার্কুইস এসে দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করল সেই ইতালিয়ান মিস্ত্রি—ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়া। ভাঙা কাচখানা মেরামত করতে তার ঘণ্টাখানেক সময়ও লাগল না।

মার্কুইস-এর হাতে কাজ ছিল না। বসে বসে খোশগল্প করলেন ঐ ইতালিয়ান যুবকটির সঙ্গে। ওর আদি নিবাস ইতালীর লম্বার্ডি অঞ্চলে—দুমেঞ্জাতে। বিয়ে-থা করেনি। বাপ ছিল আর্টিস্ট; নামজাদা নয়—একজন প্রথিতযশা চিত্রকরের অধীনে কাজ করত। কিন্তু ঠাকুর্দা ছিল সত্যই নামকরা চিত্রকর।

ভিন্‌সেন্‌জো নেমে এসেছে আরও এক ধাপ। সেও রঙ তুলি ব্যবহার করে। তবে শুধুমাত্র রঙমিস্ত্রি হিসেবে। চুনকাম করার কাজে, অথবা ডিস্‌টেম্পার। ওয়াল-পেপারিং, কাচ-লাগানোর কাজেও দড়। বাইশ বছর বয়সে কাজের ধান্দায় ফ্রান্সে চলে আসে। আর দেশে যায়নি। মনের

দুঃখে। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল রাগারাগি করে। লেখাপড়া বেশি শেখেনি। একটু-আধটু খবরের কাগজ পড়তে পারে। ওর দুই দাদাই লেখাপড়া শিখেছে। চাকরি-বাকরি করছে। এই রঙমিস্ত্রি প্রায়-বেকার ছোটভাইকে অন্ন জোগাতে তাদের বুক ফেটে যেত। যতটা না তাদের, তার চেয়ে তাদের বউদের ! ভিন্‌সেন্‌জো তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় বলে এসেছিল—'পায়ে হেঁটে যাচ্ছি, গাড়ি করে যদি না ফিরি তবে কোনদিনই দেশে ফিরব না !' বেচারির সে স্বপ্ন সফল হবার কোনও সম্ভাবনাই এ ক-বছরে দেখা দেয়নি। দৈনিক তিন-ফ্রাঁ মজুরিতে গ্রাসাচ্ছাদনই কষ্টকর। পারীর মত দুর্মূল্যের বাজারে।

মার্কুইস ওর হাতে একটা বিশ ফ্রাঁর নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, সামনের দোকান থেকে কিছু খাবার আনতে। লোকটা নিয়ে এল। তাকেও ভাগ দিলেন, নিজেও খেলেন। ভাঙানিটা ফেরত চাইলেন না। বরং আরও ঘনিয়ে আলাপ জমালেন। বললেন, শোন ভিন্স্, তোমার স্বপ্ন আমি সফল করতে পারি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাও !

লোকটা হাঁ হয়ে গেল। চর্বণকার্য বন্ধ হয়েছিল তার, তবু গলকণ্ঠটা ওঠানামা করল। আমতা আমতা করে বলে, মানে ? আমার কোন্ স্বপ্ন সফল হবার কথা বলছেন আপনি ?

—ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে তুমি একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ড কিনবে। মটোর গাড়ি চেপেই যাবে তোমার দেশে !

— কী বকছেন স্যার, পাগলের মতো ! একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ডের দাম কত জানেন ?

— কত আর হবে ? ধর দশ হাজার ফ্রাঁ ? আমি তোমাকে বিশ হাজার ফ্রাঁ দেব !

— বি-শ হা-জা-র ! —লোকটা হাঁ হয়ে গেল !

অনেকক্ষণ সে কথা বলল না। মেঝেতে আঁকিবুঁকি আঁকল আঙুল দিয়ে। তারপর চোখ তুলে বললে, আপনার প্রস্তাবটা কী ?

একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসলেন মার্কুইস। প্রস্তাবটা এই রকম চেহারা নিল :

ডক্টর রিচার্ডসন ইতিমধ্যে ঐ তিব্বতি ছবিখানির একটি হুবহু নকল এঁকে ফেলেছেন। সেটি লুকিয়ে রেখে এসেছেন ভারতবর্ষেই। পুরনো সিল্কের ওপর আঁকা ছবি— যাতে বোঝা না যায় যে সেটা নকল। ওঁর প্রস্তাব—উনি ভিন্‌সেন্‌জোকে নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছলে ভিন্স সবার আগে রাজদরবারের পিছনের দেওয়ালে ছবিখানাকে বুলেট-প্রুফ কাচে আটকে দেবে। এ কাজটা তাকে করতে হবে রাজার ব্যবস্থাপনায়, অর্থাৎ সশস্ত্র প্রহরায়। ফলে আসল ছবিটাই সুরক্ষিত করতে হবে তাকে। কিন্তু ছবিখানার সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে প্রহরায় কিছু শিথিলতা দেখা দেবে। নেহাৎ যদি তা না হয় তাহলে ডক্টর রিচার্ডসন দু-একটি রাজ-প্রহরীকে উৎকোচে বশীভূত করে সে ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন ভিন্স্-এর কাজ হবে—একদিন গভীর রাত্রে এসে ঐ বুলেটপ্রুফ কাচটা ফ্রেম সমেত খুলে ফেলে নকল ছবিটা সেখানে বসিয়ে দেওয়া ! ব্যস্ ! তাহলেই কেল্লা ফতে ! তারপরেই ভিন্স্‌কে নিয়ে উনি ফিরে আসবেন ইউরোপে। আসল ছবিখানা নিয়ে উনি চলে যাবেন ওঁর লন্ডনের ডেরায় আর বিশ-হাজার ফ্রাঁ পকেটে নিয়ে ফোর্ড গাড়ি চেপে মসিয়োঁ ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়া চলে যাবে ইতালীতে—সেই লম্বার্ডির দুমেঞ্জাতে ! যারা সামান্য রঙ-মিস্ত্রি বলে একদিন ওকে হেনস্থা করেছে তাদের চোখগুলো নাটানাটা হয়ে যাবে ! যাবে কি যাবে না সে তো ভবিষ্যতের কথা, প্রস্তাবটা শুনে সামান্য রঙ-মিস্ত্রিটার চোখ এখনই নাটা-নাটা হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আমি রাজী ! পুরো বিশ হাজার কিন্তু !

—বুলেট-প্রুফ কাচটা খুলে নকলখানা আঁটকে তোমার কতক্ষণ সময় লাগবে?
— ধরুন আধঘণ্টা।
— মাত্র? তার মানে তুমি প্রথমবার আল্‌গাভাবে আটকাবে? না ভিন্স্! তা হবে না!
— না স্যার! প্রথমবারে আমি খুব মজবুৎ করেই সাঁটব।
— তাহলে মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে কেমন করে সব কাজ সারবে তুমি?
— যে লাগায়, সে জানে কী করে খুলতে হয়।
— আমার বিশ্বাস হয় না। ধর ল্যুভারের ঐ 'মোনালিসা'খানা। ওটা খুলে নিতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার?
— ঐ আধঘণ্টাই! যতক্ষণ লেগেছিল নেপোলিয়ঁর!
— নেপোলিয়ঁ! মানে? কোন নেপোলিয়ঁ?
— নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তির। কেন, আপনি জানেন না—কীভাবে ছবিটা ল্যুভারে এল?
সেটা ভালভাবেই জানা ছিল মার্কুইস্-এর। কিন্তু তিনি অজ্ঞতার ভান করে বললেন, কীভাবে?
অশিক্ষিত ভিন্স্ তার জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিল এবার। ল্যুভারের অধিকাংশ শিল্পই নাকি ইতালিয়ান চিত্রকরদের আঁকা—লেঅনার্দো, তিজিয়ানো, রাফায়েল, বত্তিচেল্লি, ভেরোনিজ, এল গ্রেকো, ভেরমিয়র— কে নয়? কোন শালা ফরাসী অমন ছবি আঁকতে পারে? সব লুটের মাল! নেপোলিয়ান বোনাপার্তি ইতালী থেকে সব কিছু অপহরণ করে এনেছে!
মার্কুইস তাজ্জব বনলেন। তাঁর ধারণা ছিল এল গ্রেকো ছিলেন গ্রীক, ভেরমিয়ার নেদারল্যান্ড-এর চিত্রকর—আর 'মোনালিসা'খানাকে নেপোলিয়ান আদৌ অপহরণ করে আনেননি। চিত্রকর স্বয়ং বিক্রয় করেছিলেন ফরাসী সম্রাটকে।
তা হোক! ভিন্স্‌কে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা আস্বাদন না করানোই ওর পক্ষে সুবিধার। লোকটাকে বাজিয়ে দেখা হয়ে গেছে। বিশ হাজার ফ্রাঁতে যে কল্পিত 'লাফিং বুদ্ধা' অপহরণে স্বীকৃত, তাকে পঞ্চাশ হাজার অফার করলে সে লেঅনার্দোর 'মোনালিসা'খানাও খুলে এনে দেবে। বিশেষ, সে তো ইতালিয়ান হিসেবে একশ বছর পরে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির কুকর্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে!
অতি ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন মার্কুইস। শাঁদ্রর সঙ্গে ল্যুভারে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন বুলেট-প্রুফ কাচের ফ্রেমের একপ্রান্তে খুব ছোট হরফে লেখা আছে GOBIER.
টেলিফোন গাইড হাতড়ে তাদের ঠিকানা জোগাড় করলেন। ডক্টর রিচার্ডসনের নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকের পরিচয়ে সন্ধান করলেন—কে ঐ বুলেট-প্রুফ কাচের আবরণী লাগিয়েছে। ঘটনাচক্রে পেয়ে গেলেন এই বোকা-সোকা ইতালিয়ান রঙ-মিস্ত্রিটাকে। এখন ওর বিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে আর তার সঙ্গে মোটা অঙ্কের উৎকোচের লোভ দেখিয়ে বাকি কাজ সারতে হবে।
ধুরন্ধর মার্কুইস-এর পক্ষে সে কাজটা সহজেই হয়ে গেল।
কীভাবে ছবিখানা লুভ্যার থেকে অপসারণ করতে হবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উনি বুঝিয়ে দিলেন। কাজটা ভিন্স্‌কে একা-হাতে করতে হবে না। আরও দুজন সহকারী থাকবে তার সঙ্গে। তারা দুদিকের দরজায় পাহারা দেবে।
পরিকল্পনাটি নিখুঁত।

এবার আমরা বরং ফিরে আসি বিশ-এ আগস্ট উনিশ শ এগারো তারিখে। অর্থাৎ যে-মঙ্গলবার, বাইশ তারিখে মোনালিসাখানা অপহৃত হয়েছে বলে জানা গেল তার আগের রবিবারে। ইতিমধ্যে শাঁদ্র ছবিখানার একটি ছোট মাপের হুবহু নকল বানিয়েছে। সেটা নিয়ে জাহাজে চেপে অতলান্তিকের ওপারে চলে গেছে। কাস্টমস্-এ তাকে কোনই বেগ পেতে হয়নি, ছবিখানা আকারে ছোট হওয়ায়। যাবার আগে সে মার্কুইস-এর কাছে নির্দেশ পেয়েছে তাকে মার্কিন মুলুকে পৌঁছে ছ'খানি নকল করতে হবে। হ্যাঁ, এক বা দুটি নয়, ছয়খানা! মার্কুইস চিত্রাপহরণের পূর্বেই ছয়-ছয়জন ক্রেতার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন এই ক'মাসে। চারশ বছরের প্রাচীন ক্যানভাস জোগাড় করতে হয়নি। কারণ শাঁদ্র ইতিমধ্যে ইন্‌স্‌তুৎ দ্য নাশিওনেলে পড়াশুনো করে জানতে পেরেছে চারশ বছর আগে লেঅনার্দো মূল ছবিখানা এঁকেছিলেন সূক্ষ্মগ্রেনওয়ালা একখন্ড পপ্‌লার কাঠের ওপর। মূল ছবিটার মাপ সাতাত্তর সে.মি বাই তিপান্ন সে.মি। সুতরাং শাঁদ্র 'অ্যান্টিকুইটি শপ' থেকে একটি চার-পাঁচশ বছরের পুরাতন ইটালিয়ান পালঙ্ক ক্রয় করলেন—ঐ পপ্‌লার কাঠের। তা থেকে ছ'খানি ঐ মাপের প্যানেল কেটে বার করা হল। সব কিছু নিয়ে তিনি স্টিমার ধরে অতলান্তিকের ওপারে চলে গেলেন।

এপারের কথা বরং বলি :
রবিবার, বিশে আগস্ট বেলা আড়াইটে । উনিশ শ এগারো সাল । ল্যুভারের দুটি প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন তিনজন দর্শনার্থী। পোর্তে দেনঁ প্রবেশদ্বার দিয়ে যিনি এলেন তিনি পাঠকের পরিচিত। যদিও বেশবাস দেখে তাঁকে চেনবার উপায় নেই। মাথায় সুদৃশ্য হ্যাট, গায়ে কালো ওভারকোট। বাঁ-হাতটার কনুই দেহের সঙ্গে সাঁটা—কারণ ওভারকোটের নীচে আছে পুঁটুলি-পাকানো আর একটি পোশাক। ইনি মসিয়োঁ ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়া। বহুদিন ল্যুভারে কাজ করেছেন—গোবিয়ার কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে—ল্যুভারের প্রায় প্রতিটি প্রত্যন্ত বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। আজ অবশ্য এসেছেন নিতান্ত দর্শনার্থী হিসাবে।
প্যাভেলিয়ঁ সালী দিয়ে প্রায় একই সময়ে প্রবেশ করলেন আর দুজন দর্শনার্থী। দু'ভাই—লান্সিলোত্তি ভ্রাতৃদ্বয়—ভিন্সেঞ্জো আর মিকেল। এঁরা দুজনেই ফরাসী। মার্কুইস কর্তৃক নিয়োজিত। 'সালে লা কেজ' প্রদর্শনীশালার উত্তেয়ু (Watteau) এবং ব্যুশের-এর চিত্রসম্ভার দেখতে দেখতে তাঁরা এগিয়ে চলেন সালোঁ কেয়ারের দিকে।
বেলা চারটে নাগাদ ঐ দুই ভাইয়ের সঙ্গে পেরুগিয়ার সাক্ষাৎ হল সালে দুশাতেল গ্যালারির কাছাকাছি। ওঁরা যে পরস্পরকে চেনেন, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ল্যুভারে এসেছেন এমন কথার আভাসমাত্র পাওয়া গেল না। পেরুগিয়া তার হাতঘড়িটা দেখল—ল্যুভার বন্ধ হতে ঠিক একঘণ্টা বাকি। মনে মনে সে আর একবার আওড়ে নিল সিনর রিচার্ডসনের নির্দেশ। মার্কুইস ওয়াল-ফিয়েনোকে সে ঐ নামেই চেনে। ওয়ালফিয়েনোর নাম সে জীবনে কখনো শোনেনি; তাঁর পকেটে যে আলবার্তো গঞ্জালেস্-এর নামাঙ্কিত পাসপোর্ট আছে সে-কথা তো স্বপ্নেও আশা করতে পারে না! সিনরকে সে বিশ্বাস করেছে। কথা আছে, কাজ হাসিল হলে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হাতে-হাতে পাবে। ছোট মাপের নোটে—এক সুটকেস বোঝাই!
বারটা বুদ্ধি করেই ধরা হয়েছিল রবিবার। যেহেতু পরদিন, সোমবার, ল্যুভার দর্শনার্থীদের কাছে রুদ্ধদ্বার। সেটা ঝাড়া-পোঁছার দিন। অর্থাৎ মঙ্গলবারের আগে অপকর্মটা জানাজানি হবে না!

পেরুগিয়া সালেঁ দুশাতেল-এ এসে দাঁড়ালে। এই হল-কামরার দু-প্রান্তে দুটি আর্চওয়ে বা তোরণ। একটি দিয়ে যেতে পার পণ্যশালার ফয়ার-এ। সেখানে পাশাপাশি দোকান—ছবির নকল, ফটোগ্রাফ এচিং, বই এবং নানান শিল্পসামগ্রী সেখানে বিক্রি হয়। দ্বিতীয় সিংহদ্বার দিয়ে যেতে পার গোটা ল্যুভার সংগ্রহশালার 'গর্ভগৃহে' অর্থাৎ সালোঁ কেয়ারে—যেখানে থরে-থরে সাজানো আছে শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্ভার! যার মধ্যমণি : লা জ্যাকোন্ডা।

অর্থাৎ মোনালিসা।

পেরুগিয়া ধীর পদে এগিয়ে গেল 'সালেঁ দুশাতেল হল'-এর পশ্চিমপ্রান্তে। নজর পড়ল প্রকাণ্ড বড় সেগুনকাঠের দরজার পাশে ও-দিকের ছোট্ট দরজাটার দিকে।

না সে দরজাটা আজ খোলা নেই। গা-তালা লাগানো।

পেরুগিয়া জানে, ঐ ছোট্ট দরজাটা একটা গুদামঘরের—স্টোররুম। ভিতরে আছে ঝাঁটা, মই, ঝাড়ন, বাল্‌তি ইত্যাদি। ঐ ঘরের গা-তালার একটি চাবি এক সময়ে ছিল তার হেপাজতে। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর বাড়তি কাচ, রঙ-তুলি, যন্ত্রপাতি সে ওখানে জমা রেখে যেত। পরদিন নিজেই এসে বার করত সব কিছু। একটি চাবি বৎসরখানেক ছিল ওর হেপাজতে। সিনরের সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখনো ছিল। তারপর সে চাবিটা কর্তৃপক্ষকে জমা দিয়েছে মাস-তিনেক আগে; কিন্তু তার পূর্বে সিনর একটি ডুপ্লিকেট বানিয়ে নিয়েছেন। সেই ডুপ্লিকেট চাবিটা বর্তমানে ওর ডানদিকের পকেটে।

ঐ গুদামঘরে শুধু ঝাড়পোঁছ-কর্মীদের যন্ত্রপাতিই থাকে না, থাকে নিত্যশিল্পীদের রঙ-তুলি ক্যানভাসও। অর্থাৎ যারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ল্যুভারে ছবি আঁকে—যেমন আঁকে শার্দ্র অথবা বেনো। প্রতিদিন যাতে সেই শিল্পীদের রঙ-তুলি-ক্যানভাস বহন করতে না হয় তাই এ ব্যবস্থা। দিনান্তে 'সালে দুশাতেল হল'-এর প্রহরী এসে ঐ গুদামঘরের তালা খুলে দেয়, শিল্পীরা যে যার রঙ-তুলি-ক্যানভাস জমা রাখে। খালি হাতে বাড়ি ফেরে। আবার পরদিন সকালে এসে উপস্থিত হলে কোনও প্রহরী দরজাটা খুলে দেয়; শিল্পীরা যে যার সাজ-সরঞ্জাম বার করে নেয়। এ ব্যবস্থা সপ্তাহে পাঁচ দিন। সোমবার, ঝাড়া-মোছার দিনে প্রদর্শনী বন্ধ থাকে। শিল্পীরা সেদিন আঁকার সুযোগ পায় না। এছাড়া রবিবারেও ঐ নিত্য-শিল্পীদের ছুটি—কারণ সেদিন এত ভীড় হয় যে, শিল্পীদের পক্ষে বসে আঁকার সুযোগ-সুবিধা থাকে না। এসব তথ্যটি পেরুগিয়ার ভালরকম জানা।

তার নির্গলিতার্থ : যে কোন শনিবারের বিকাল পাঁচটা থেকে সোমবার সকালের মধ্যে ঐ ঘরটার দরজা খোলা হয় না। সোমবার সকালে খোলা হয় ঝাড়-পোঁছের সরঞ্জাম বার করে নিতে।

বিকেল চারটে বেজে পঁয়ত্রিশে ঘণ্টাধ্বনি হল। অর্থাৎ আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ল্যুভার বন্ধ হয়ে যাবে।

সালে দুশাতেল হল-এর প্রহরীদল সমস্বরে কলধ্বনি করে ওঠে : On ferme!

পাশাপাশি অন্যান্য গ্যালারির প্রহরীকণ্ঠেও সমবেত শিবাধ্বনির মত প্রতিধ্বনিত হল On ferme! অর্থাৎ ল্যুভার এবার বন্ধ হবে—যে যার পথ দেখুন!

প্রতিদিনের অতি পরিচিত দৃশ্য। রক্ষকদল দর্শকদের সবিনয়ে খেদিয়ে নিয়ে চলছে নির্গমন দ্বারগুলির দিকে। পেরুগিয়াও ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলে। তারপর সুযোগ মত সুট করে সরে দাঁড়ায় দরজাটার আড়ালে। প্রহরী পিছন ফিরতেই চট করে পকেট থেকে চাবিটা বার করে খুলে ফেলে স্টোর-রুমের

দরজাটা। প্রহরীটা ওকে দেখতে পায়নি; পেলেও সে বিস্মিত হত না—কারণ সে পেরুগিয়ার মুখ চেনে। জানে যে, ঐ রঙ মিস্ত্রিটার কাছে গুদাম ঘরের একটি চাবি থাকে। সে যে চাবিটা ফেরত দিয়েছে সেটা প্রহরীর জানা থাকার কথা নয়। তা সে যাই হোক, প্রহরী এটা নজর করেনি। দরজাটা খুলেছে কি খোলেনি কোথা থেকে লাঙ্গিলোত্তি দু-ভাই সুরুৎ করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। এবং তৎক্ষণাৎ পেরুগিয়াও। ভেতর থেকে ঠেলে দরজটা বন্ধ করে দিল। এটুকু ঘটনা ঘটতে সময় লাগল আন্দাজ পনের সেকেন্ড।

ভিতরটা নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়। ওপরের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে দিবাবসানের শেষ আলোকরশ্মি এখনো আসছে। হয়তো ঘণ্টাখানেক পরে নীরন্ধ্র তমিস্রায় ঢেকে যাবে এই গুদাম ঘরটি। তার আগেই দেখে নিতে হবে কোথায় কী আছে। যাতে অন্ধকারে ধাক্কা লেগে শব্দ না হয়। চারিদিকে ঈজেল, রঙের বাক্স, বালতি, ঝাড়ু, ঝাঁটা, ঝাড়ন।

তিনজনে নিঃশব্দে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে বসল। এভাবেই সারাটা রাত ওদের বসে থাকতে হবে। বাইরে মানুষের পদধ্বনি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ। পেরুগিয়া তার হাত-ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজে তিন! অর্থাৎ লুভারের মেন গেট-এ তিন মিনিট আগে তালা পড়েছে! এখন এ প্রাসাদ সম্পূর্ণ নির্জন!

পেরুগিয়া হাসল। হাসি সংক্রামক—ওর দুই সহকর্মীও হাসল তা দেখে।

কোথা দিয়ে সারাটা রাত কেটে গেছে! ওরা তিনজনে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পালা করে রাতটা জেগে কাটালো। পেরুগিয়ার ধূমপানের নেশা আছে। কিন্তু সিনরের বারণ। একা থাকলে সে মানত না; কিন্তু এই দুজন যদি বলে দেয়, তাহলে সিনর হয়তো রাগ করবেন। আর রাগ করে যদি তিনি ওর প্রাপ্য থেকে কিছু বাদ দিয়ে দেন...নাঃ! নেশাটা চেপে রাখল পেরুগিয়া। সারা রাতে ওরা নিম্নস্বরে কথাবার্তাও বিশেষ বলেনি।

পেরুগিয়া ঘুমিয়ে ছিল শেষ রাতে। তাকে ঠেলে তুলল মিকেল ।

ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আলোর ছোঁয়া। এবার বিপরীত দেওয়ালটিতে একটা গোলাকার আলোক চিহ্ন। পশ্চিমের দেওয়ালে। ঘড়িটা দেখল পেরুগিয়া। সকাল পাঁচটা পঁয়ত্রিশ ।

তিনজনে উঠে দাঁড়ায়। ওভারকোটের ভিতরে চেপে ধরা টিউনিক বার করে। সাদা অ্যাপ্রন-জাতীয় একটা পোশাক—বুকে ল্যুভার সংগ্রহশালার 'লোগো'। এটাই ওদের পাসপোর্ট। সোমবারে ল্যুভারের ভিতরে নিরাপদ বিচরণের। ঝাড়াই-পোঁছাই কর্মীর ছদ্মবেশে। জর্জেস্ পিকো হচ্ছে ঝাড়াইদলের কুলি-সর্দার । প্রতি সোমবারে তার অধীনে না-হোক শতখানেক কর্মী সাফাই কাজে নিয়োজিত হয়। তার মধ্যে দশ-পনের জন ডেলি-লেবার। সকলের সনাক্তিকরণ চিহ্ন ঐ বিশেষ অ্যাপ্রন। যা দর্জি দিয়ে বানিয়ে ওদের হাতে আগেই ধরিয়ে দিয়েছেন সিনর।

অ্যাপ্রন চড়িয়ে পেরুগিয়া সাবধানে গা-তালাটা ভিতর থেকে খুলে দরজাটা এক আঙুল-মতো ফাঁক করে দেখে। নাঃ! 'সালে দুশাতেল হল' নিস্তব্ধ, নির্জন।

তিনজনে বেরিয়ে আসে প্রদর্শনী কক্ষে। এখনো ঘণ্টাখানেক সময় হাতে আছে। জর্জেস্ পিকোর কর্মীদল প্রধান ফটকের সামনে হাজিরা দেয় সকাল সাড়ে ছ'টায়। হাজিরা খাতায় সই দিয়ে তারা প্রস্তুত হয়। প্রধান ফটকও খোলে ঐ সাড়ে ছ'টাতেই। সাফাই-ওলারা সার দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

সাবধানের মার নেই। প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকেই একজন টেনে নিল একটা লম্বা ঝাড়ু, অপরজন

একটা ঝাড়ন। দুজনে দু-প্রান্তে পাহারায় দাঁড়ালো। পেরুগিয়া পকেট থেকে স্ক্রু-ডাইভার, প্লাস, রেঞ্চ্ ইত্যাদি বার করতে করতে এগিয়ে গেল 'সালোঁ কেয়ারে হল'-এর দিকে।

মিনিট কুড়ি লাগল ছবিটা খুলে বার করতে। পেরুগিয়া মনে মনে হাসল। সিনর সেদিন বিশ্বাস করতে চাননি আধঘন্টার ভিতর সে দেওয়াল থেকে মোনালিসাকে উপড়ে নিতে পারবে—ঠিক যেভাবে একদিন নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তি ইতালীয় কোন সংগ্রহশালা থেকে উপড়ে নিয়েছিল ঐ ইতালিয়ান সুন্দরীর ছবিখানা—মোনালিজা, লা জ্যাকোন্ডা।

মনে মনে পেরুগিয়া বললে, হে ইতালীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী! —না:। হে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী—লেঅনার্দো! তোমার প্রতি যে অসম্মান করেছিল সেই ফরাসী বোম্বেটেটা—তোমার মানসীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল ভিঞ্চি থেকে পারীতে—আজ আমি তার প্রতিশোধ নিলাম ! তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক !

মিকেল পিছন থেকে ধমক দেয়, কী বিড়বিড় করছ হে তুমি? ফ্রেমটা তো খোলা হয়ে গেছে! নেমে এস টুল থেকে।

পেরুগিয়া নেমে পড়ে। মিকেল টুলটাকে ঘরের ওপ্রান্তে সরিয়ে দেয়।

ওরা তিনজনে গ্রান্ড-গ্যালারি অতিক্রম করে এসে পৌঁছায় একটা সিঁড়ির মুখে। এটি দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয়, সাফাই-ওয়ালাদের জন্য। সেখানে পৌঁছে এক অন্ধকার কোণায় পেরুগিয়া সাবধানে ছবির কাচটা ভেঙে ফেলল। ফ্রেম থেকে বার করে নিল মোনালিসার ছবিখানা। মিকেল আর ভিন্ ঐ ফ্রেম আর কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল সিঁড়ির অন্ধকার গহ্বরে। বেসমেন্টে কোথায় গিয়ে সেটা ভূস্পর্শ করল তা দেখা গেল না।

তিনজনে চলতে শুরু করতেই মিকেল ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো।

মনুষ্য কণ্ঠস্বর! কারা যেন এদিকেই আসছে ।

পেরুগিয়া দ্রুতগতিতে পপ্লার কাঠের টুকরোটা—যার একদিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ছবিখানি আঁকা—ঢুকিয়ে দিল ওভারকোটের নিচে।

সিঁড়ির নিচে একটি সার্ভিস-ডোর; অর্থাৎ কর্মীদের ব্যবহারের জন্য। এটা সচরাচর ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। এই দরজাটা খুলে ফেলতে পারলেই ওর বাগানে বেরিয়ে পড়বে।

পেরুগিয়া সবিস্ময়ে দেখল—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা নয়। তার অজ্ঞাতে কখন এ দরজায় একটি গা-তালা লাগানো হয়েছে! ডোর-নবটা ঘুরিয়ে দেখল সেটা তালা বন্ধ!

এটা পেরুগিয়ার ভ্রান্তি! তারই দোষ। সে নিজেই সিনরকে বলেছিল—এ দরজাটা সব সময় ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। ঠিকই বলেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে যে এই গা-তালাটা লাগানো হয়েছে তা ও জানত না। দোষ ওরই—কারণ গতকাল এসে এটা দেখে যাওয়া উচিত ছিল।

মিকেল বলল, কী হল? সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দরজা খোল?

— খুলছে না! ওটা তালা বন্ধ !

— মানে ? ওর চাবি নেই তোমার কাছে?

— না! নেই!

— সে কী! তাহলে...মানে...

এ কী ইঁদুর-কলে বন্দী হয়ে পড়ল ওরা! পেরুগিয়ার ওভারকোটের ভিতর লা জ্যাকোন্ডা—কর্মীদলের পদশব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে—অথচ সামনে রুদ্ধদ্বার।

— কী করতে চাও এখন? —মিকেলের আর্ত প্রশ্ন।

— তোমরা দু-দিকে পাহারা দাও। আমি লক্‌টা খুলে ফেলছি।

ওর পকেট থেকে স্ক্রু-ডাইভার বার করে ইস্কুরুপগুলো খুলতে থাকে। কিন্তু বাঁ-বগলে যে ধরা আছে লিজা জ্যাকোন্ডার সেই ছবিখানা। বাঁ-হাতটা তাই পুরো কার্যকরী নয়। এ অবস্থায় ছবিখানা বার করতেও সাহস হচ্ছে না। তিনটে স্ক্রু খুলে গেল, চতুর্থটা কিছুতেই ঘুরল না। বাধ্য হয়ে মোনালিসাকে ওর ঘামের গন্ধ থেকে মুক্তি দিয়ে সে ডোর নব্‌টা ধরে প্রচণ্ড জোরে পাক মারল। যা:! উপড়ে ভেঙে বেরিয়ে এল পেতলের ডোর-নব্‌টা।

দরজা কিন্তু খুলল না।

সিঁড়ির ও-প্রান্ত থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই মিকেল সাবধানবাণী শোনালো : Attenti!

অর্থাৎ কেউ এদিকেই আসছে। পেরুগিয়া দ্রুতহস্তে তার যন্ত্রপাতি মায় ডোর নব্‌টা ভরে ফেলল ওভারকোটের পকেটে। তুলে নিল ছবি-আঁকা পপ্লারের টুকরোটা। ঢুকিয়ে দিল ওভারকোটের ফোকরে। ঠিক তখনি শিস দিতে দিতে এগিয়ে এল একজন!

লোকটা মুখচেনা। নাম জানা নেই যদিও। ল্যুভারের একজন রেগুলার স্টাফ। প্লাম্বার।

চোখাচোখি হতেই সে বললে, হ্যালো!

দারুণ বুদ্ধি জোগালো পেরুগিয়ার মাথায়। সে একটা খিস্তি ঝাড়ল, এই সেদিন গা-তালাটা লাগালুম আর কোন্ সুবুদ্ধির-পো ডোর নবটা চুরি করেছে! এখন বাইরে যাব কেমন করে? চাবির ফুটো দিয়ে গলে?

লোকটা বললে, সাত-সকালেই খিস্তি-খেউড় কেন করছ ভায়া? এস, আমি খুলে দিচ্ছি। আমার কাছে ওর চাবি আছে।

এতক্ষণে পেরুগিয়ার মনে পড়েছে প্লাম্বার মিস্ত্রিটার নাম : সভে!

একগাল হেসে বললে, থ্যাঙ্কু সভে!

— উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ! শিস দিতে দিতে লোকটা অন্যদিকে চলে গেল।

ওরা তিনজনে বার হয়ে এল বাগানে।

এই ছোট্ট ভিতরের উঠোনটির পোশাকি নাম : Cour du Sphinx.

পরিকল্পনা মতো উঠানটা পার হয়ে ওরা চলে এল পরবর্তী প্রাঙ্গণে: কোর ভিকন্তি। এর দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড আর্চ। আর তার ওপাশে মুক্ত পৃথিবী।

কিন্তু এখানেও এক বিপদ। দরজায় একজন দ্বারপাল। তার চোখের সামনে দিয়ে পার হওয়া যাবে না। সে ভাববে হাজরির খাতায় নাম সই করে অ্যাপ্রন-পরা কোন কর্মী কেটে পড়ছে। মোনালিসা চুরির অপরাধে নয়, কাজে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে ওদের চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে।

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে ! ভিতর দিক থেকে কে যেন দ্বাররক্ষককে নাম ধরে ডাকল। 'যাই স্যার' বলে সাড়া দিয়ে লোকটা সেদিকে এগিয়ে গেল। মাত্র পাঁচ-সেকেন্ড! সেটুকুই যথেষ্ট। ওরা তিনজনেই বার হয়ে এল কোয়ে দু ল্যুভার সড়কে।

তখন সকাল আটটা । বাইরে ঝলমলে রৌদ্র । মানুষজনের আনাগোনা। ওরা সরে এল একটা গাছের আড়ালে। ঝট্‌পট্ একে একে খুলে ফেলল অ্যাপ্রনগুলো। পুঁটলি পাকিয়ে ভরে নিল ওভারকোটের পকেটেই।

পেরুগিয়া সেটা পকেটে ঢোকাতে গিয়ে অনুভব করল পেতলের ডোর-নবের মুন্ডিটা। এখন সে খুশিয়াল। মুক্ত পৃথিবীর খোলা হাওয়ায়।

এখন ওরা পারী-শহরের অগণিত মানুষের যে কোনো তিনজন। পেরুগিয়া রাস্তার পাশের বেড়া টপকিয়ে পেতলের ডোর-নবটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা পুকুরে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার ও-প্রান্ত দিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী যাচ্ছিল। ব্যাপারটা তার নজরে পড়ল। পড়ত না, কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সূর্যালোকে পেতলের নব্‌টা চক্‌চক্ করে উঠেছিল যখন সেটা অধিবৃত্তের পথে শূন্যমার্গে চলেছিল পুকুরের জলের দিকে। খণ্ড-মুহূর্তের জন্য সাইকেল-আরোহীর মনে হয়েছিল : জিনিসটা কী? অমন চক্‌চকে?

পরমুহূর্তেই পুকুরের জলে একটা শব্দ হল: টপ্!

ছোট-ছোট বৃত্তাকার ঢেউ তুলে জলরাশি শান্ত হল।

সাইকেল-আরোহীও ভুলে গেল তার কথা। ত্রিশ-মিটার হাঁটতেই রু-দে-তুলিয়ার্স-এর মোড়। এখন অবশ্য সড়কটার নাম আভিন্যু-দে-জেনেরাল লেমনিয়ে। সেখানেই অপেক্ষা করছিল কালো রঙের ফোর্ড গাড়িটা। সিনরের প্রতিশ্রুতিমতো। ড্রাইভার জানতে চাইল, কোথায় যাবেন আপনারা?

ভিন্সেঞ্জো লান্সিলোত্তি একটা বস্তির নাম বলল। ঐ বস্তির নামটাই 'কোড-মেসেজ'।

লোকটা নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল। ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি মুহূর্তমধ্যে স্টার্ট দিল। ওরা তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। পেরুগিয়া আবার তার ঘড়িটা দেখে। তার বসতে অসুবিধা হচ্ছিল ওভারকোটের ভিতর সাতাত্তর বাই তিপান্ন সে.মি. মাপের একখানা পপ্‌লারের টুকরোর জন্যে। কিন্তু ছবিখানা বার করতে পারল না। সিনরের নির্দেশ তা নয়। কে জানে হয়তো ঐ মটোরগাড়ির চালক আদৌ জানে না যে, ওরা তিনজনে কয়েক শ' কোটি ডলারের সম্পদ নিয়ে চলেছে।

অনেক বাঁক ঘুরে গাড়িটা এসে দাঁড়ালো পারীপ্রান্তের একটি বস্তির দ্বিতলবাড়ির সম্মুখে। ওরা নেমে যেতেই গাড়িটা হাওয়া হয়ে গেল। পেরুগিয়া বললে, ও ভাড়া নিল না তো?

লান্সিলোত্তি বললে, ও আমাদের দলের। ভাড়া মেটানো আছে। এস, ওপরে এসো।

দ্বিতলে—না দ্বিতলে নয়, গ্যারেট-অংশের একটি ছোট্ট খুপরিতে এসে উঠল ওরা। এ ঘরখানা মাদাম সিগ্যুয়েনোর। ফ্রাঁসোয়া সিগ্যুয়েনো হচ্ছে ভিন্সেঞ্জো লান্সিলোত্তির রক্ষিতা! দিনে সে ধোপানি, রাত্রে লান্সিলোত্তির শয্যাসঙ্গিনী। মহিলাটির বয়স বছর ত্রিশ। ব্যাপারটা মেয়েটি জানে বোঝা গেল। একখানা খবরের কাগজে কাঠের প্যানেলটা জড়িয়ে নিয়ে সে আলমারির ভিতরে তুলে রাখল। বললে, এখন তোমরা যে যার কাজে যেতে পার। পুলিসের বাবারও সাধ্য হবে না এই গ্যারেট ঘরটা খুঁজে বার করার!

পেরুগিয়া ছুটে বেরিয়ে এল নিচে। একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠল।

গোবিয়ার কোম্পানির দিন-মজুর সে। রু দ্যে ম'বেগ-এ সকাল সাতটায় তার হাজিরা দেওয়ার কথা। সেখানে সে গিয়ে পৌঁছালো বেলা ন'টায়।

হাজিরার খাতায় সই দেবার সময় ওর বস বললে, আজ আবার কী হল? এত লেট?

পেরুগিয়া সলজ্জে স্বীকার করল, গতকাল রাত্রে অত্যধিক মদ্যপান করায় সে সকালে ঠিক সময়ে উঠতে পারেনি।

সর্দারের কোনো সন্দেহ হল না—কারণ আজ সোমবার। প্রতি সোমবারেই দু-চারজন হাজরি দিতে দেরী করে ফেলে। রোববারের খোঁয়াড়ি ভাঙতে তাদের দেরী হয়ে যায় প্রতি সপ্তাহেই।

কাজে ছুটি হতেই পেরুগিয়া ছুটল সেই গ্যারেট-ঘরের উদ্দেশ্যে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল মাদামের সেই ঘিঞ্জি ঘরে ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন ওঁরা তিনজন—লান্সিলোত্তি ভ্রাতৃদ্বয় আর স্বয়ং সিনর।

সিনরকে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল পেরুগিয়া। বিস্ময়ের হেতুটা ওঁর সাজ-পোশাকের জন্য। তাঁর পরিধানে গ্রীজ আর কালিঝুলি মাখা একটা ওভার-অল, পিঠে একটা রুক্‌স্যাক, সঙ্গে একটা সুটকেস। কে বলবে উনি ডক্টর রিচার্ডসন—রাজস্থানের এক সংগ্রহশালার কিউরেটর। এই বস্তিতে যে জাতের মেহনতি-মানুষদের হামেহাল দেখা যায় যেন তাদেরই একজন।

সিনরের নির্দেশে মেয়েটা আলমারি থেকে কাগজে-মোড়া কাঠের প্যানেলটা বার করে দিল। ভাঁজ খুলতেই মোনালিসা ফিক্ করে হেসে ফেলল! না, ঠিক ফিক্ করে নয়, তার ঠোঁট দুটি হাসছে না, হাসছে চোখের তারা। কী কারণে ওর চোখের তারায় মোহাবিষ্ট হাসির আলিম্পন তা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝে উঠতে পারেনি; তবে আজ মনে হচ্ছিল সেটা যেন চুরি করে আচার খাবার দুষ্টুমিতে। যেন বলছে—বন্দিশালা থেকে কী করে পালিয়ে এসেছি দেখছ?

সিনরের চোখ দুটোও চক্‌চক্ করে উঠল। মোনালিসার হাসি প্রতিবিম্ব ফেলল ওঁর নীলচোখের মণিতে। কাগজে জড়িয়ে ছবিখানি তিনি ফেরত দিলেন মাদামকে। সে সযত্নে ছবিখানা তুলে রাখল আলমারিতে—তার ব্লাউস-কর্সেট-গাউনের ফাঁক-ফোকরে।

এবার সিনর সুটকেসটা খুলে ফেললেন। তাতে কিছু শার্ট-প্যান্ট-টাই। সেগুলি অপসারণের পরে দেখা গেল বাকি আয়তনটা পূর্ণ হয়েছে তাড়া-বাঁধা নোটের বান্ডিলে। গুণে গুণে তিনটি থাক নিলেন উনি। দুই ভাই ও মাদামকে নোটের বান্ডিলগুলি হস্তান্তরিত করলেন। পেরুগিয়া সতৃষ্ণনয়নে শুধু তাকিয়েই রইল। তার দিকে এগিয়ে এল না কোনো নোটের তাড়া। ওদের তিনজনকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বললেন, সবই লোয়ার ডিনোমিনেশনের কারেন্সি নোট। তবু সাবধানে খরচ কর। রাতারাতি রাজা-উজির বনতে চাইলে পাঁচজনের সন্দেহ জাগবে।

উঠে পড়লেন এবার। পেরুগিয়াকে বললেন, এস আমার সঙ্গে।

একখানি হ্যাক্‌নি-ক্যারেজ ভাড়া করে শহরের উত্তরদিকে চললেন। পেরুগিয়ার আস্তানার আধ কিলোমিটার দূরে গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। যদিও পেরুগিয়ার ডেরা পর্যন্ত সে আমলে ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারত, তবু উনি সে সুযোগ নিলেন না। কী দরকার একটা সূত্র রেখে যাওয়ার? সওয়ারি কোথা থেকে এল কোথায় গেল তা গাড়োয়ানটাকে জানানোর কী প্রয়োজন?

পেরুগিয়া বস্তির একখানা গোটা-কামরা নিয়ে থাকে। কাঠের বাড়ি, টালির ছাদ, পাশাপাশি এক-কামরার খুপ্‌রি। মেহনতি মজদুরদের। দ্বার অর্গলবদ্ধ করে সিনর প্রথমেই তর্জনীটা নিজের ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করলেন—অর্থাৎ কথাবার্তা নিম্নস্বরে বলতে হবে। পাশের কামরার লোকটা আড়ি পাতলেও যেন কিছু শুনতে না পায়। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, তোমার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে। মন দিয়ে শোন :

সিনর ওকে বুঝিয়ে বললেন—অচিরেই পুলিস পেরুগিয়ার খোঁজ করবে। এটা অবধারিত। কারণ সে দীর্ঘদিন ল্যুভারে কাজ করেছে। তবে সেটা হবে 'রুটিন-চেক'। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

পেরুগিয়া যেন পুলিসের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে। হয়ত পুলিসে ওর ঘর তল্লাসী করবে—কিছুই পাবে না। যতদিন না সেটা হচ্ছে ততদিন সে যেন লাঙ্গিলোত্তি ভ্রাতৃদ্বয় অথবা মাদামের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করে। তার জীবনযাত্রায় যেন কোনও পরিবর্তন না হয়। গোবিয়ার কোম্পানির রঙ-মিস্ত্রির কাজটা চালিয়ে যায়। পুলিসের তল্লাসী হয়ে যাবার পর সে যেন মাদামের কাছে যায়; ছবিখানা নিয়ে আসে। মাদামকে নির্দেশ দেওয়াই আছে। সে চাইলেই ছবিখানা তাকে দিয়ে দেবে। তারপর পেরুগিয়া তার এই বস্তির ঘরে ছবিটা খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখবে। খুব সাবধান, ইঁদুরে না কাটে।

পেরুগিয়া ওঁকে নিশ্চিন্ত করে, না এখানে ইঁদুরের উপদ্রব নেই। উইপোকাও নেই। আমি স্ক্রু-ডাইভার দিয়ে দেওয়ালের একটা কাঠের প্যানেল খুলে লুকিয়ে রাখব।

— আর শোন। আমি কাল-পর্শুর মধ্যেই লন্ডনে চলে যাব। মাসখানেক থাকব। তারপর ফিরে এসে ছবিখানা তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব। নাও ধর—

একটা নোটের ছোট্ট বান্ডিল উনি বাড়িয়ে ধরেন পেরুগিয়ার দিকে।

পেরুগিয়া বললে, কত আছে ওতে?

— পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

— মাত্র পাঁচ?

সিনর হাসলেন। মোনালিসা-হাসি! বললেন, বোকার মত কথা বল না ভিন্স্! পুলিসে তোমার বাড়ি তল্লাসী করবে। তখন কী কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? এ ক'বছরে ওর চেয়ে বেশি তোমার সঞ্চয় হতে পারে?

কথাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু...

—অবিশ্বাস করছ আমাকে? কিন্তু ছবিখানা তো পারীতেই রইল। আমি ফিরে না এসে যাব কোথায়? তাছাড়া আমার লন্ডনের ঠিকানাও তুমি জান...

— না, সিনর। সে-কথা নয়, কিন্তু আপাতত মাত্র পাঁচ হাজার?

— হ্যাঁ! বাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার আমি ফিরে এলে। সেকেন্ড-হ্যান্ড ফোর্ড নয়, তুমি ইচ্ছে করলে নতুন 'ডিম্‌লারে' চেপেও লম্বার্ডিতে ফিরে যেতে পার।

— আর সেই 'লাফিং বুড্‌ডা' ছবিখানা? আমরা ভারতবর্ষে যাব না?

মার্কুইস্-এর ইচ্ছে করছিল 'লাফিং বুডডা'র মতো অট্টহাস্য করে উঠতে। তার পরিবর্তে বললেন, সেটা তো স্থির হয়েই আছে। তার আগে এখানকার গতি করি।

এবার সুটকেস খুলে তিনি ধোপ-দুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছেদ বার করলেন। তাপ্পিমারা তেলচিটে ওভার-অলটা পাল্‌টে রওনা হয়ে গেলেন তাঁর খানদানি পাঁচ-তারা হোটেলের দিকে।

পথে পোস্ট-অফিস। সেখানে দাঁড়িয়ে খানতিনেক টেলিগ্রাফ করলেন— নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, লস্ অ্যাঞ্জেলেস্।

পরের সাতটা দিন পারীর মানুষ বোধকরি আর কিছুই আলোচনা করেনি।

শুধু মোনালিসা, আর মোনালিসা! সংবাদপত্রের বুকোদরভাগ দখল করল চারশ বছর আগেকার সেই জ্যাকোন্ডা কুলবধূ। এ যে অবিশ্বাস্য! প্রকাশ্য দিবালোকে ল্যুভারের কঠোর প্রহরা নস্যাৎ করে কীভাবে 'বুলেট-প্রুফ' কাচের আবরণ ভেঙে অন্তঃপুরচারিণীকে অপসারিত করল ওরা?

আর কেনই বা তা করল? মোনালিসা তো কেনা-বেচা করা যাবে না। কেউ তার বৈঠকখানায় মূল ছবিটা টাঙিয়ে রাখতে পারবে না। আন্তর্জাতিক আইনে তখনই তার হাতে হাতকড়া পড়বে। আর বাক্সে বন্ধ করে রাখার জন্য কেউ নিশ্চয়ই কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঐ ছবিখানা কিনবে না। তাহলে? চোরের উদ্দেশ্য কী? পাকা-পাকা মাথার সাংবাদিকেরা নানান থিওরি শোনালেন। কেউ বললেন,এ শুধু প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বেইজ্জত করার একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। কারও মতে, কোনও 'মেগালোম্যানিয়াক্' অপরাধ-জগতের সম্রাট এভাবে বিশ্বকুখ্যাত হতে চাইছে। পারীর সবচেয়ে বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ফিগারো' সম্পাদকীয়তে বললেন, ''সরকারী গোয়েন্দা-বিভাগের তৎপরতায় আমাদের আশঙ্কা হয়, অচিরেই হয়তো আমাদের ছাপতে হবে—প্রকাশ্য দিবালোকে কে-বা-কাহারা নত্রদাম-গীর্জার চূড়াটা অপহরণ করে নিয়ে গেছে, এবং পুলিস অপরাধী বা চোরাই মালটা খুঁজে পাচ্ছে না''।

তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়তো জনৈক সরকারী মুখপাত্র বিবৃতি দিলেন, ''এমন আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে, কোন বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্রের তরফে এই কুকাজটা করা হয়েছে একটা প্লীহাকম্পনাত্মক সংবাদ পরিবেশন করে কাগজের কাট্‌তি বৃদ্ধি করতে। সে-ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকার মুনাফা-শিকার শেষ হলেই কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মারফৎ ছবিখানা সরকার ফেরৎ পাবেন!''

সে আমলে—বলা যায় আজকেও যেমন—ভাগ্য গণনাকারীদের ছিল ফলাও ব্যবসা! সম্মোহনের মাধ্যমে সত্য-উদ্‌ঘাটন, ক্রিস্টাল-বলে সত্য-নিরূপণ, ফলিত-জ্যোতিষের সাহায্যে তস্কর-অন্বেষণ! একটি পত্রিকা ঘোষণা করলেন—অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যদি কোনও যোগী মোনালিসা-অপহরণকারীর পাত্তা বাৎলাতে পারেন তাহলে তাঁকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হবে। তার ফলে অনেক-অনেক ভেল্‌কি পণ্ডিত মাথার ঘাম পায়ে ফেললেন। কাজের কাজ কিছু হল না।

গোয়েন্দা বিভাগ কিন্তু বসে নেই।

পরদিনই ল্যুভার তল্লাসী করতে গিয়ে তারা উদ্ধার করল সিঁড়ির তলা থেকে একটা ভাঙা ফ্রেম আর কাচের টুকরো। কিউরেটার নিঃসন্দেহ—সেগুলি ঐ অপহৃত চিত্রটির আবরণ ছিল। ল্যুভারের প্রতিটি কর্মীর জবানবন্দী নেওয়া হল। ঐ সময় একজন দোকানদার স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে পুলিসের কাছে একটা জবানবন্দী দিয়ে গেল। সে নাকি ঐ সোমবার সকাল আটটা নাগাদ সাইকেলে করে 'কোয়ে দু ল্যুভার' দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখতে পায় একজন পথচারী কী-একটা চক্‌চকে জিনিস পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিমজ্জমান মানুষ যেভাবে খড়-কুটো আঁকড়ে ধরতে যায় সেভাবেই পুলিস জাল ফেলল ঐ পুকুরে, ডুবুরি নামালো জলে। অচিরেই উদ্ধার করা গেল একটি ডোর-নব্। আশ্চর্য!

সিঁড়ির নিচে একটি ডোর-নব্ ভাঙা!

পুলিস একটা সূত্র পেল!

সাইকেল-আরোহীর জবানবন্দী অনুসারে পুলিস বিজ্ঞপ্তি দিল: ''সোমবার বাইশে আগস্ট ল্যুভারের কাছাকাছি নিম্ন বর্ণনা অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে কেউ যদি দেখে থাকেন তবে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—উচ্চতা মাঝারি, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, চোখে চশমা নেই, একহারা চেহারা, দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় কালো টুপি, পরনে কাল্‌চে কোট-প্যান্ট, হাতে একটা চৌকো কিছু—যা মোনালিসা ছবির আকারে।''

ঐ বর্ণনার সঙ্গে পেরুগিয়ার সাদৃশ্য অল্পই। তার বয়স অনেক কম। তার হাতে চৌকো কোন কিছু ছিল না। আর ঐ বর্ণনা অনুসারে পারীতে তখন অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ বাস করে। তাই ঐ বিজ্ঞপ্তির ফলে বিশেষ কিছুই হল না। হল সামান্য ফল—পেরুগিয়া গোঁফ কামানো ছেড়ে দিল আর বিনা পাওয়ারের একটা চশমা কিনে নাকে চড়ালো!

গোয়েন্দা বিভাগের সবচেয়ে যেটা অসুবিধে, তা হচ্ছে বিভাগীয় রেশারেশি । পারী-শহরের দুর্নীতিদমনের দায়িত্ব বর্তেছে 'পারী-প্রিফেক্তুর'-এর ওপর অথচ সমগ্র ফ্রান্সের অপরাধ দমনের অধিকার 'সুরেতে নাশিওনেল'-এর !

অনেকটা আমাদের ক্যালকাটা পুলিস আর ওয়েস্ট-বেঙ্গল পুলিসের মতো। এক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না। এঁরা যে তথ্যটা আবিষ্কার করেন তা ওঁদের জানান না, ওঁরা যে সূত্রটা খুঁজে পান তা এঁদের বিজ্ঞাপিত করেন না। অর্থাৎ ধরা-পড়ার পর চোর ধরার ষোল-আনা কৃতিত্বটা যেন নিজ নিজ বিভাগে বর্তায়।

এই দুই বিভাগের একটা সমঝোতা আনবার উদ্দেশ্যে সরকার একজন বিচার বিভাগের অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে বসিয়ে দিলেন তদন্তকার্যের সর্বাধিনায়ক করে। তিনি অঁরি দ্রিয়ো। কিন্তু তিনিও হালে পানি পেলেন না।

ঘটনার সমকালে ফ্রান্সে উপস্থিত ছিলেন একজন আশ্চর্য অপরাধ বিজ্ঞানী। কারও কারও মতে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ-বিজ্ঞানী। তাঁর নাম: আলফোঁসে বার্তিলোঁ। তাঁর পশ্চাদপটের কাহিনী একটু শোনাই আগে : জন্ম 1853 সালে। পারীতেই। মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, 1914তে, মাত্র একষট্টি বছর বয়সে। পিতার দ্বিতীয় পুত্র। বাবা ছিলেন পারীর একজন চিকিৎসক। ছাত্রজীবনে মোটেই ভাল রেজাল্ট করতে পারেননি। কিন্তু কৈশোরেই দেখা গেল তাঁর অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়ের জোর। সেনাবাহিনীতে আবশ্যিকভাবে তাঁকে যোগদান করতে হয়েছিল। কাজ পড়েছিল মিলিটারী হাসপাতালে। ঐ মেডিকেল স্কুলেই তাঁর ঝোঁক পড়ল 'নরকঙ্কাল' বস্তুটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করার। খেয়ালী মানুষ—ওঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে প্রতিটি মানুষের সব কয়টি অস্থিই কি দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে একরকম? একের পর এক মাপ নিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন—না, তা নয়। মানব-দেহের প্রায় সওয়া দুই শতটি অস্থির মাপ তার দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে গঠিত নয়। তার একটা আলাদা ছন্দ আছে!

উনি হিসেব করে দেখলেন—বিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে মানুষের দেহে কতকগুলি অস্থির মাপে অদল-বদল হয় না। সুতরাং ঐ যে লোকটা—পাঁচ বছর আগে জেল থেকে ছাড়া-পাওয়া পঁচিশ বছরের টম আর আজকের ধরা-পড়া ত্রিশ বছরের ডিক—এরা অভিন্ন কিনা বুঝে নিতে ঐ হিসেবটা কার্যকরী হতে পারে। ওদের ওজন এক নয়, চুলের রঙ বিভিন্ন, ডিক-এর মুখে প্রকাণ্ড এক ক্ষতচিহ্ন, যা টমের মুখে ছিল না—কিন্তু ওদের দুজনেরই বাঁ-দিকের ফিমার বোন-এর মাপ ৩৫৬ মিলিমিটার।

বার্তিলোঁ এই নয়া-বিজ্ঞানটির নাম দিলেন এ্যান্থ্রোপোমেট্রি!

ইতিমধ্যে তিনি মিলিটারী সার্ভিস শেষ করে যোগ দিয়েছেন পারীর পুলিস-বিভাগে। নিতান্ত নিম্নস্তরের মসীজীবী—আমাদের ভাষায় 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক'। কিন্তু ঐ বাতিকটা লেগে আছে। থানায় যত অভিযুক্ত ব্যক্তি আসে, বার্তিলো ফটো ছাড়াও ফাইলে গেঁথে রাখে তার অপরিবর্তনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ! প্রসঙ্গত বলি, প্রায় শতবর্ষপূর্বে সঙ্কলিত সেই প্রাথমিক

তালিকাটি আজও ফরাসী জাতীয় সরকারের অপরাধ-বিজ্ঞান সংগ্রহ-শালায় সযত্নে রক্ষিত। 'মুজিয়ামের এক্সিবিট' হিসেবে নয়—অপরাধীদের সনাক্তিকরণে আজও তা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রায় আশী লক্ষ অপরাধীর খতিয়ান আছে সেই ক্যাটালগে।

তাঁর ঐ পদ্ধতিতে গত শতাব্দীর শেষপাদে অনেক অপরাধীর মেয়াদ হয়ে হয়ে যায়। ওঁর সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বড় জাতের রহস্য সমাধান করতে নানান বিদেশী সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাতে থাকেন—বার্তিলোর সাহায্য চেয়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অসম্ভব রহস্যের সমাধান করে ফেললেন—ঠিক যেভাবে কল্পনা রাজ্যে শার্লক হোমস্; ইয়ারকুল প্যারো বা এদেশে ব্যোমকেশ বক্সীরা করেছেন। প্রতিদানে রাশিয়ার 'জার' নিকোলাস ওঁকে একটি মুক্তাখচিত সোনার টেবিলঘড়ি উপহার দিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়া দিলেন সোনার মেডেল।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বার্তিলোঁই বুঝি 'ফিঙ্গার-প্রিন্ট'-বিজ্ঞানের জনক। এ কথাটা ঠিক নয়। প্রতিটি মানুষের 'টিপছাপ' যে বিভিন্ন এ-কথা চীন দেশের পণ্ডিতেরা জানতেন প্রায় দেড়-হাজার বছর আগে থেকেই। ওরা নিরক্ষর মজদুরদের টিপছাপ নিত তাদের মজুরি মিটিয়ে দেবার সময়। ইউরোপ-খণ্ডে ব্যবস্থাটা চালু করেন একজন ইংরেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের পেনশন দেবার সময় সই ছাড়াও টিপছাপ নেবার ব্যবস্থাটা চালু করেন, যাতে টমের বদলে প্রায় সমবয়সী ডিক্ বা হ্যারী পেনশন না নিয়ে যায়। ব্যাপারটা খ্যাপাটে অফিসারের পাগলামী বলেই সকলে ধরে নেয়। 'ফিঙ্গার-প্রিন্ট' সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করে থিসিস লেখেন একজন ইংরেজ অপরাধ বিজ্ঞানী, যার জন্য তাঁকে নাইটহুড দেওয়া হয় : সার ফ্রান্সিস গ্যালটন। 1892 সালে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অপরাধ-বিজ্ঞানীরা তত্ত্বটা আদৌ মেনে নিতে রাজী হননি। অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনীহায় পড়েছিল এই বিজ্ঞান।

আলফোঁসে বার্তিলোই প্রথম সেই পদ্ধতির সাহায্যে কয়েকটি হাল-ছেড়ে-দেওয়া রহস্যের অপূর্ব সমাধান করে পদ্ধতিটার ব্যবহারিক স্বীকৃতি দেন। এ জন্যই বার্তিলোঁ বিশ্বের নমস্য।

কিন্তু আমরা যে সময়ে আছি, অর্থাৎ মোনালিসা চিত্র অপহরণের অব্যবহিত পরে তখনো এই ফিঙ্গার-প্রিন্ট বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহশীল। ওটাকে প্রায় বুজরুকির পর্যায়ে ফেলা হচ্ছিল তখনো। পারীর পুলিস-বিভাগ এবং কর্তা-ব্যক্তিরা ওটা মেনে নিলেও মনে নেননি। তা হোক—হস্তরেখাবিদ, ঐন্দ্রজালিকদের পর্যন্ত যখন ডাকা হচ্ছে তখন ঐ পাগলাটাকেও সরকার আহ্বান করলেন। বার্তিলোঁ সিঁড়ির নিচে উদ্ধার পাওয়া কাচখণ্ডে একটি আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করলেন। বললেন, এটি অপরাধীর হাতের টিপছাপ! পুলিস সন্দেহভাজন কাউকে গ্রেপ্তার করলেই যেন তার আঙুলের টিপছাপ সংগ্রহ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিস যে সন্দেহভাজন কাউকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি এ পর্যন্ত। ল্যুভারের প্রতিটি কর্মীর টিপছাপ নেওয়া হল—কিন্তু ঐ কাচখণ্ডের ফিঙ্গার-প্রিন্টের সঙ্গে কারও টিপছাপের মিল হল না।

সে সময়ে বার্তিলোঁর সংগ্রহশালায় সাড়ে সাত লক্ষ টিপছাপের সংগ্রহ! ফ্রান্সের প্রতিটি জেলখানার প্রতিটি অপরাধীর অ্যালবাম। এমনকি প্রমাণাভাবে যেসব সন্দিগ্ধ অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরও। বার্তিলোঁর সহকর্মীরা ক্রমাগত সেই তালিকা ধরে মিলিয়ে যায়, কিন্তু কোনও হদিস করতে পারে না। কেতাদুরস্ত গোয়েন্দারা পাগলের পাগলামি দেখে মনে মনে বোধ করি হাসলেন!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—ঘটনার তিন বছর আগে পেরুগিয়াকে একবার ডাকাতির অভিযোগে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছিল। পেরুগিয়া সত্যিই সে ডাকাত দলে ছিল না, সে নিরপরাধ হিসেবে বেকসুর ছাড়া পায়। কিন্তু তার টিপছাপ রাখা ছিল বার্তিলোঁর সেই ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়। নিতান্ত ভাগ্যের দয়ায় সাড়ে সাত লক্ষ টিপছাপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে বার্তিলোর কোন সহকর্মী কাচের ওপরের টিপছাপটি সনাক্ত করতে পারেনি। পারলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেরুগিয়া ধরা পড়ে যেত!

বিশ্বাস করা কঠিন—গোয়েন্দা বিভাগ আদৌ সন্দেহ করতে পারেনি যে, গোবিয়ার কোম্পানির তরফে যেসব কর্মী ল্যুভারে বুলেট-প্রুফ কাচ লাগিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ এ কাজের অংশীদার হতে পারে! এই সম্ভাবনাটা কারও মাথায় উদয় হলে গোবিয়ার কোম্পানির দশ-বিশজন কর্মীর আঙুলের টিপছাপ নিয়ে মিলিয়ে দেখা যেতে পারত। আমার তো মনে হয়েছে তার হেতু এই যে, আলফোঁসে বার্তিলোঁর এই আবিষ্কার—'ফিঙ্গার-প্রিন্ট-সায়েন্স' তখনও পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। আজকের দিনে আমরা সেই মানসিকতাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারব না। কারণ-অপরাধ বিজ্ঞানে আজ 'ফিঙ্গার-প্রিন্ট' স্বীকৃত!

তাই দেখছি, কর্তৃপক্ষ ল্যুভারের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সেই প্লাম্বার সুভে-কে শুধু হাজার হাজার অপরাধীর ফটোগ্রাফ দেখিয়ে চলেছেন—যদি সে ঘটনাচক্রে সেই লোকটাকে চিনতে পারে, যে লোকটা ঘটনার দিন সকালবেলাতেই খিস্তি-খেউর করে বলেছিল ডোর-নবটা কেউ চুরি করেছে!

সিনরের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল একদিন। ভোররাতে কে যেন করাঘাত করল দুয়ারে। ঘুম-চোখে উঠে এসে দোর খুলে দিল পেরুগিয়া। চমকে উঠল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কঠিন সংযমে গলকণ্ঠটাকে ওঠা-নামা করতে দিল না। চিনছে, তবু বোকার মত বললে, কে আপনারা ? কী চাই?

পুলিস ইন্সপেক্টর সার্চ ওয়ারেন্ট বার করে দেখালো।

— ও! আসুন, ভিতরে এসে বসুন। এ পাড়ায় চুরি-চামারি হয়েছে নাকি? শুনিনি তো?

পুলিস অফিসার ভাঙা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। পকেট থেকে নোটবই বার করে বললে, মসিয়োঁ পেরুগিয়া, আপনার বয়স কত? আদি নিবাস?

পেরুগিয়া যথাযথ সত্য জবাব দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, কী খুঁজছেন বলুন তো?

এবারও ইন্সপেক্টার জবাব দিল না সে প্রশ্নের। বরং জানতে চাইল, আপনার কোনও পুলিস-রেকর্ড আছে?

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝেছে, তবু ন্যাকা সেজে বললে, আজ্ঞে না, পুলিসে কোনদিন চাকরি করিনি। আমি বরাবরই চাকরি করছি ঐ গোবিয়ার কোম্পানিতে।

— আহ্! সে-কথা বলছি না। বলছি, আপনাকে কি কোনদিন পুলিসে অ্যারেস্ট করেছিল? মেয়াদ খেটেছেন ?

— ও! সেই কথা? আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিসে একবার হাজতে ধরে নিয়ে যায়। কী একটা ডাকাতির কেসে। আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। জজ-সাহেব বেকসুর খালাস দেন ।

— আপনি একুশে আগস্ট, সোমবার দু-ঘণ্টা পরে হাজরির খাতায় সই করেছেন দেখা যাচ্ছে। সকাল সাতটার পরিবর্তে বেলা ন'টায়। ঐ দু'ঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন ?

পেরুগিয়া বোকা-সোকা । কিন্তু এই মুহূর্তে সে তার ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ রেখেছে। ফাঁদে সে পা দিল না। এখনো পুলিসে তাকে জানায়নি যে, ওরা মোনালিসা ছবির তল্লাসিতে এসেছে। তাই প্রত্যাশিত জবাবই দিল সে, ও বাবা! একুশে আগস্ট তো অনেকদিন আগেকার কথা। লেট হয়েছিলাম কিনা তা কি আমার মুখস্ত আছে?

— হ্যাঁ হয়েছিলেন। আমারা খাতায় দেখেছি!

— কী বার বললেন যেন?

— সোমবার ।

— তাহলে বোধ হয় তার আগের রবিবার রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলাম । আমার ঠিক মনে নেই। দু-তিন মাস অন্তর সোমবার-সোমবার আমার এমনটা হয়। তাই বলছি।

পুলিসে তন্ন তন্ন করে ওর ঘরটা সার্চ করল। কিছুই পেল না।

তারপরও দিনসাতেক অপেক্ষা করল পেরুগিয়া। পুলিস দ্বিতীয়বার ফিরে এল না দেখে সে একটা কাঠের ট্রাঙ্ক কিনে আনল। যন্ত্রপাতি নিজের কাছেই আছে। ঐ বাক্সের একটা 'ফলস্-বটম্' বানালো। খাটের নিচে সেটাকে রেখে চলে গেল মাদামের ডেরায়। প্রার্থনা মাত্র ছবিখানা মাদাম ওকে হস্তান্তরিত করল। একটা বড় আশঙ্কা দূরীভূত হল ওর। বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। ওর ভয় ছিল মাদাম ছবিখানা হস্তান্তরিত করতে চাইবে না। যা হোক, এখন আর তার আশঙ্কার কিছু নেই। সিনর ফিরে আসতে বাধ্য। যেহেতু রঙের টেক্কাটা ওরই হেপাজতে। বস্তিতে ফিরে এসে ছবিখানা একটা পাতলা কাগজে মুড়ে শুইয়ে দিল ট্রাঙ্কের তলায়। তারপর দ্বিতীয় কাঠখানা পেতে দিল। ছোট-ছোট পেরেক সেঁটে সেটাকে সুরক্ষিত করল। জাতে রঙ-মিস্ত্রি! এমন নিপুণভাবে কাঠের বাক্সটা রঙ করে পেরেকের মাথা ঢাকা দিল যে, কোন শালা গোয়েন্দার বাপেরও সাধ্য নেই বুঝে ফেলে—ওটা দোতলা বাক্স!

তার দু-সপ্তাহ পরে একদিন পেরুগিয়ার ডাক পড়ল বড় সাহেবের ঘরে।

ঘরে ঢুকেই ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মসিয়োঁ পন্তিফ্-এর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে আছেন সিনর—মানে ডক্টর রিচার্ডসন!

এবারও অসীম সংযমে গলকণ্ঠটা ওঠা-নামা করতে দিল না। মনে মনে শুধু বললে, পথে এস বাছাধন! রঙের টেক্কাটি নিয়ে বসে আছি আমি। পালাবে কোথায়?

পন্তিফ্ বললেন, ভিন্স, একটা দুঃসংবাদ আছে!

রীতিমতো আঁৎকে উঠেছে পেরুগিয়া! দুঃসংবাদ! কী জাতীয়?

—ডক্টর রিচার্ডসন ভারতবর্ষের সেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে, তোমাকে ওঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে হচ্ছে না!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল পেরুগিয়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে। তাই কায়দা করে বললে, কিন্তু স্যার, ওঁর সেই অগ্রিম-দেওয়া তিন'শ ফ্রাঁ যে আমি খরচ করে বসে আছি!

ড: রিচার্ডসন বললেন, সেজন্য চিন্তা কর না। তোমাকে অসুবিধায় ফেলার জন্য সেটা আমার খেশারত। ওটা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

— থ্যাঙ্কু স্যার !

অভিবাদন করে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে! কিন্তু তক্কে-তক্কে থাকে কাছে-পিঠেই। একটু পরে সিনর বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। পেরুগিয়াও পিছু নিল তাঁর। বেশ কিছুটা অনুসরণ করে গোবিয়ার কোম্পানির দোকান থেকে অনেকটা দূরে এসে পাকড়াও করল তাঁকে। সিনর একটুও অবাক হলেন না। রাস্তাটা পার হয়ে ওপারের পার্কের ভিতর দিয়ে শর্টকাটের পথ ধরলেন। পেরুগিয়াও আঠার মতো সেঁটে রইল তাঁর সাথে । বেশ ফাঁকা মত জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিনর। বললেন এই চাবিটা ধর। এটা পারী সেন্ট্রাল-স্টেশনের একটা লকারের। ঐ লকারে একশ ফ্রাঁর নোটে পঁয়তাল্লিশ হাজার আছে। লকারটার তিন মাসের ভাড়া মেটানো আছে। ধীরে ধীরে ওটা অপসারণ করে ফেল! বুঝলে ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ! আর ছবিখানা ?

— ওটা তোমার কাছেই আপাতত থাক। এখনো খদ্দের ঠিক করতে পারিনি। সেটা স্থির হলেই আমি এসে নিয়ে যাব। মাস-তিনচার দেরী হবে হয়তো। ব্যস্ত হয়ো না! যদি আরও দেরী হয় তাহলেও নয়। বুঝতেই তো পারছ—ও ছবির খদ্দের জোগাড় করা কী কঠিন ?

পেরুগিয়া হাত কচলে বললে, সে আর বুঝিনি ? কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে মনে হল কালো-বাজারে ওর দাম বিশ-ত্রিশ লক্ষ ফ্রাঁও হতে পারে!

— তাই নাকি ? তা হবে!

— সে-ক্ষেত্রে খদ্দের জোগাড় হলে আমি আর কিছু পাব না ?

সিনর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। না, শ্রুতিসীমার কাছাকাছি কেউ নেই। বললেন, তুমি কতটা আশা করছ ?

— ফিফ্‌টি পার্সেন্ট, স্যার! ধরুন, সবকিছুই তো আমি একা হাতে করেছি!

সিনর বিচিত্র হাসলেন। হাসিটা পেরুগিয়ার দ্বিতল বাক্সের নিচের ছবিটার মত। বললেন, তুমি দশ-পনের লক্ষ হজম করতে পারবে ?

পেরুগিয়া একগাল হেসে বললে, কী যে বলেন স্যার! ল্যুভার থেকে মোনালিসাখানা হাতিয়ে আনতে পারলাম আর...

— চুপ কর ! পথে-ঘাটে এসব কথা বলতে নেই! ইডিয়ট কোথাকার!

পেরুগিয়া চুপ করে গেল। বলল না যে, কাছে-পিঠে কেউ নেই! মনে মনে স্থির করল, সিনরকে সে লেজে খেলাবে। রঙের টেক্কাখানা যখন ওর কাছে তখন আর ভয় কি! ওকে 'ইডিয়ট' বলার শোধ একদিন না একদিন সে তুলবে!

সিনর একটা গাড়ি ডেকে উঠে বসলেন।

পেরুগিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটল পারী সেন্ট্রাল স্টেশনে। আশেপাশে কেউ নেই দেখে লকারটা খুলে দেখল। হ্যাঁ, থাক-দেওয়া কারেন্সি-নোট! কত আছে গুনে দেখবার সাহস হল না। একমুঠো তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল। তারপর লকার বন্ধ করে শিষ্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরল।

না, বাড়ি পর্যন্ত ফিরতে পারল না। পকেটটা ওকে খোঁচা দিতে থাকে। একটা ঘোড়ার-গাড়িকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। হ্যাক্‌নি-ক্যারেজ নয়, ল্যান্ডো।

গাড়িতে উঠে বসতেই কোচম্যান বললে, কোন্‌দিকে যাব মসিয়োঁ ?

— ফলি বজোয়াঁ!

পারীর এই সর্ববিখ্যাত নাইট-ক্লাবের নামটা সে বহুবার শুনেছে বহুলোকের মুখে, সামনে দিয়ে গেছে কত-কতবার। ভিতরে প্রবেশ করার না ছিল হিম্মৎ, না পকেটের জোর!

উনিশ'শ বারো সালের বসন্তকাল। অর্থাৎ দেড়-বছর পরের কথা।

অনেক-অনেক জল বয়ে গেছে ইতিমধ্যে সীন নদীর একাধিক সাঁকোর তলা দিয়ে।

সংবাদপত্রে মোনালিসা অপহরণের কোনো সংবাদ ছাপা হয়নি বহুদিন। প্রসঙ্গটা সবাই ভুলে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধী বা অপহৃতের সন্ধান পায়নি। নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ব-ললিতকলার দরবারে তাদের এই লজ্জাকর অসাফল্য। সালোঁ কেয়ারের সেই শূন্যস্থানটার—সেই যার একদিকে করেজ্জোর 'সেন্ট ক্যাথারিনের অলৌকিক পরিণয়' আর অপরদিকে তিজিয়ানোর 'অ্যালিগরি'—সেই মর্ম-বিদারক শূন্যস্থানটায় কর্তৃপক্ষ টাঙিয়ে দিয়েছেন রাফায়েল-এর আঁকা একটি পোর্ট্রেট : রেনেসাঁ যুগের এক রাজপুরুষের তৈলচিত্র—বল্‌দাসারে কাস্তিগ্‌লিয়ঁ। তা নিয়ে কোনো পত্রিকা কিন্তু কোনোও ব্যঙ্গাত্মক সংবাদ পরিবেশন করেনি! কারণ সবাই মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত একটি জাতীয় অবমাননাকর দুর্দৈব! শুধু কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্তের ঘোষণা যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সেদিন ঘটল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পারীর জনসাধারণের সেন্টিমেন্টালিটির এক বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। সেদিন পারীর আপামর দর্শনার্থী ফুলের ব্যুকে হাতে ল্যুভারে গেল। সালোঁ কেয়ারের একটা শূন্যস্থানের পদতলে নিঃশব্দে রেখে এল থোকা থোকা ফুলের স্তবক। সেই হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে!

পেরুগিয়া কিন্তু দেশে ফেরেনি।

গাড়ি কিনবার সাহসই হয়নি তার। কী কৈফিয়ৎ দেবে সে ? কোথায় পেল এত টাকা ? তিনমাসের মাথায় লকারটা খালি করে বান্ডিল-বাঁধা নোট নিয়ে এল নিজের বাসায়। ইতিমধ্যে সে অপেক্ষাকৃত একটি অভিজাত পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে! দামী দামী পোশাক কিনেছে। জীবনযাত্রার ভোলটাই পাল্‌টে গেছে তার। গোবিয়ার কোম্পানির চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন! লকারে কত টাকা ছিল কোনদিনই গুনে দেখেনি। কী হবে হিসেব করে ? রঙের টেক্কাখানা যতদিন তার আস্তিনে লুকনো আছে ততদিনে পাঁচ-দশ হাজার কম বেশীতে কী যায় আসে ?

একটি সুন্দরী বান্ধবী জুটে গেল তার। সেটাই স্বাভাবিক। বান্ধবীটি পাকা খেলোয়াড়। কোনদিন জানতে চায়নি ওর উপার্জনের উৎসটার বিষয়ে। সে শুধু দু'হাতে ঐ হঠাৎ-নবাবকে দোহন করতে থাকে। পেরুগিয়া বোঝে সব— ভ্রুক্ষেপ করে না। সে নিশ্চিত—তার কুঁজোর জল শেষ হবার আগেই ফিরে আসতে বাধ্য হবে সিনর। না এসে যাবে কোথায় ? কুইন-অব্-হার্টস্ যে ওর হেপাজতে!

তারপর একদিন সে গুনতে বসল তার কুবেরের সঞ্চয়। কোথায় কবে কিভাবে খরচ হয়েছে জানে না—কিন্তু অবশিষ্ট আছে মাত্র হাজার পাঁচেক। বান্ধবীটিকে বিদায় করল অতঃপর। কোনো

বেগ পেতে হল না এ বিষয়ে । মেয়েটিও বুঝে ফেলেছিল তার কাপ্তেন ফোতো হয়ে এসেছে।
পেরুগিয়া চ্যানেল পার হয়ে এল লন্ডনে। চিহ্নিত ঠিকানায় স্যামুয়েল রিচার্ডসন নামে কেউ থাকেন না। কোনকালে কেউ ছিলেন না। দিন দুই গোটা এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে ও বুঝতে পারল—'সিনর' নামে যে লোকটাকে সে চেনে তার নাম ডক্টর স্যামুয়েল রিচার্ডসন নয়। হয়তো লোকটা ব্রিটিশারই নয়। না হোক! কিন্তু সে কেন এভাবে আত্মগোপন করে আছে?
রঙের টেক্কাটার সন্ধানে তাকে যে আসতেই হবে ওর দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি হাতে!লোকটা ওকে 'ইডিয়ট' বলেছিল না? শোধ নেওয়া যে বাকি!
ফিরে এল পারীতে।এবার আবার বাড়িটা বদলালো।কেঁচে যাওয়া ঘুঁটির মত তার সাবেক ডেরায়। সেই কাঠের বাড়ি, টালির ছাদ। রোজ রাত্রে গুনতে বসে ব্যালেন্সটা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অনেকদিন আগে উঠিয়ে নিয়েছে। সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে এই—কমদামী মদে আর মন ওঠে না। বিশ্রী অভ্যাসটা। সৌখিন যা কিছু কিনেছিল—পকেট-ঘড়ি, আসবাব মায় পোশাক-পরিচ্ছদ একে একে বেচে দিল অথবা 'পনশপে' বন্ধক দিয়ে ফ্রাঁ নিয়ে এল।
লোকটা বেমক্কা মারা যায়নি তো? ঐ 'সিনর' নামের বিচিত্র মানুষটা ? তাই হবে। এ-ছাড়া তার ফিরে না আসার আর কোন যুক্তিপূর্ণ হেতু থাকতে পারে না। সে তো নিজে চোখে দেখেছে না-হোক লক্ষ ফ্রাঁ সে খরচ করেছে ওদের চার জনকে সহকারীরূপে পাওয়ার জন্য। তাহলে ছবিখানা নিতে আসছে না কেন?
কেন? কেন? কেন?
কাটল আরও কটা মাস।
পুঁজি এসে ঠেকেছে তলানিতে। গোবিয়ার কোম্পানিতে এ অবস্থায় চাকরির উমেদারি করতে যাওয়া অসম্ভব। ইতিমধ্যে তার নামে নানান মুখরোচক কেচ্ছা রটনা করা হয়েছে। ওকে নাকি অনেকেই দেখেছে—পাব্-এ, নাইট-ক্লাবে, অপেরা-হাউসে। আর তার কনুই ধরে সর্বদাই ঝুলেছে এক ফ্যাশন-দুরস্ত পারী-সুন্দরী।
আর্থিক অসচ্ছলতা, মদ, দুশ্চিন্তা আর জগদ্দল পাহাড়ের মত ভারী ঐ পপ্‌লার কাঠের টুকরোটা ওর মনের ভারসাম্য নষ্ট করল! ও মনে মনে একটা নতুন নাটক লিখে ফেলল।'মোনালিসা-অপহরণ অপেরা'। সে নাটকে 'সিনর' বলে কেউ নেই! সে নাটকে লাপিলোত্তি ভ্রাতৃদ্বয় নিতান্ত পার্শ্ব চরিত্র। মাদাম নামে একটি মহিলা-চরিত্র আছে-কি-নেই। সে নাটকের হিরো : ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়া। তরতাজা তরুণ ইতালিয়ান! যেমন তার ক্ষুরধার বুদ্ধি তেমনি মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস! ফ্রান্সের গোটা গোয়েন্দা-বিভাগ তার সম্মুখে নতশির। নায়িকা : চারশ বছরের অনন্তযৌবনা এক রহস্যময়ী নারী—যার ওষ্ঠাধরে—না, চোখের কোণায়, ছলনাময়ীর চোরা-চাহনী!আর খল-নায়ক : নেপোলিয়ঁ বোনাপার্তি—যে ঐ নায়িকাকে অপহরণ করে এনেছিল একদিন। একশ বছর পরে নাইট ইরান্ট পেরুগিয়া উদ্ধার করেছে সেই লেডি-ইন-ডিস্ট্রেস্‌কে!
অনবদ্য এ নাটকটি। সবচেয়ে মজার কথা ও নিজেও বিশ্বাস করল : এটাই সত্য!
মাঝে একদিন সে গিয়েছিল গোবিয়ার কোম্পানির দোকানের সামনে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল শো-রুমটা। এই দেড় বছরে কারবারটা আরও বড় হয়েছে। অনেক-অনেক নতুন কর্মী যোগ দিয়েছে। ও থামের আড়াল থেকে দেখল ওর সেকালের সহকর্মীরা একে-একে খাতায় সই

দিয়ে ঝোলা কাঁধে কাজে রওনা হয়ে গেল—পীতর, লেও, রবার্তো, ম্যাক্স-খুড়ো ! কী সুখে আছে ওরা! সুখ!
কী পাগলের মতো ভাবছে ভিন্স্—! একে 'সুখ'বলে? দিনভর ঐ ভারার মাথায় চড়ে দেওয়ালে পোঁচড়া মারা।
ছ্যাঃ!
কাচ কাটতে গিয়ে হাত কাটা!—থুঃ!
তার চেয়ে অনেক-অনেক আরামের কাজ হচ্ছে...কী?
সেটা কী? ভিন্স্ ঠিক মনে করতে পারল না!
আবার বাড়িতে ফিরে এল। অভুক্ত মানুষটা ফেরার পথে এক বোতল কনিয়াঁগ কিনে নিয়ে এল।
খালি পেটে তিন পেগেই নেশা হল ওর। আজ আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। কতদিন হয়ে গেল সে তার অপেরার নায়িকাকে দেখেনি! দরজাটা বন্ধ করে ও বসল স্ক্রু-ডাইভার নিয়ে। বোতলটা আধখানা হবার আগেই ও খুলে ফেলল ফল্‌স্-বট্‌মটা । বার করে আনল ছবিখানা।
আশ্চর্য! হারামজাদী এখনও হাসছে!
প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল মদ্যপটার। একটা খিস্তি ঝেড়ে বললে,তোর লজ্জা করে না,বেশ্যা মাগী! তোর উদ্ধারকারী না খেয়ে মরছে, খালি পেটে মদ গিলছে, আর তুই হাসছিস?
নাটকের নায়িকা নির্বিকার। এখনও মিটিমিটি হাসছে সে!
টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালো ভিন্স্। আবার একটা অশ্লীল খিস্তি ঝেড়ে বললে, দ্যাখ্! তোকে কী শাস্তি দিই আজ!
খাটিয়ার তলা থেকে টেনে বার করল তার রঙ্-তুলির বাক্সটা।
সিদ্ধান্তে এসেছে ভিন্‌সেন্‌জো। ঐ হারামজাদীর গোঁফ-দাড়ি এঁকে দেবে সে। চোখ দুটো কানা করে দেবে! আর কোনদিন ও যেন হাসতে না-পারে!
প্যালেটে রঙ মেশালো। ছবিখানা কাৎ করে ধরল। তারপর তুলে নিল ওর সব চেয়ে প্রিয় সরু তুলিটা। সেটা হাতে নিয়েই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। এটা ওকে ষোড়শ জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল ওর ড্যাড—ব্যর্থ ইতালিয়ান শিল্পী একজন। বলেছিল, ভিন্স্, এটা আমার বাবার তুলি! আমি এর মর্যাদা রাখতে পারিনি—দেখিস্, তুই যেন এর অমর্যাদা করিস্ না!
ঐ সঙ্গে মনে পড়ে গেল হঠাৎ ওর মায়ের কথা। বাপির ছবি বাজারে কাটেনি —কিন্তু এই তুলি দিয়ে বাপি মায়ের একখানা অনবদ্য পোর্ট্রেট এঁকেছিল । মাকে ও হারিয়েছে নিতান্ত শৈশবে। তাঁর চেহারাটা ভাল মনে পড়ে না। মায়ের কথা ভাবলেই ওর মনে পড়ে মায়ের সেই প্রতিকৃতিখানা— বাপি যেখানা এঁকেছিল। তবে মায়ের একটা স্মৃতি ওর আজও মনে আছে। তখন ওর বয়স কত হবে? চার কি পাঁচ! মা প্যান-কেক বানিয়েছিল—ও তা থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। মা কিন্তু মারধোর করেনি—মিষ্টি হেসে বলেছিল, তুই একটা পাক্কা চোর হবি!
তাইতো হয়েছে ভিন্স! পাক্কা চোর! গ্র্যান্ড-পার মতো সার্থক শিল্পী নয়, বাপির মত ব্যর্থ শিল্পীও নয়—শ্রেফ্ পাক্কা চোর!

হঠাৎ নজর পড়ল আবার মোনালিসার দিকে। এবার সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মোনালিসার মুখখানাকে সেই মুহূর্তে ঐ মদ্যপের মনে হল ওর মায়ের মুখ! ঠিক তেমনি মুখ টিপে যেন বলছে, তুই একটা পাক্কা চোর হবি!

ছবিটার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে মদ্যপটা বললে, বিশ্বাস কর মাম্‌মি! আমি ...আমি চোর নই! ঘটনাচক্রে এই অবস্থায় পড়েছি। আমি যে তোমাকে উদ্ধার করব বলে তোমার বন্ধনদশা মুক্ত করতে গিয়েছিলাম, মা!

বিশ্বললিতকলার সৌভাগ্য সে রাত্রে মদ্যপটার উচ্ছ্বাসে ছবিখানার কোন ক্ষতি হয়নি!

উনত্রিশে নভেম্বর, 1913।

নভেম্বরের শেষাশেষি পারীতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু কী করবে বেচারী? ওর যে একটাও কোট অবশিষ্ট নেই। তাপ্পিমারা ফ্লানেলের শার্টটা গায়ে চড়িয়ে ভিন্‌ হাঁটতে হাঁটতে চলে এল পোস্ট-অফিসে। ওর পুঁজি এখন শ-চারেক ফ্রাঁ। ওর ট্রাঙ্কে আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ! এখন সে কপর্দকহীন কোটিপতি!

ডাক-টিকিট কিনে সাঁটল। ফেলে দিল ডাকবাক্সে। তারপর পোস্ট-অফিসের সিঁড়ির ধাপটার ওপর বসে পড়ল। যেখানটায় এক ঝলক রোদের উত্তাপ। বেচারি অর্ধাহারে আছে হপ্তাখানেক। পকেটে যেটুকু রেস্তো আছে সেটা দেশে ফেরার রাহা-খরচ। সিদ্ধান্তে এসেছে ভিন্‌সেনজো। দেশেই তাকে ফিরতে হবে। ইতালীতে। 'সিনর' আর ফিরবে না। লোকটা নির্ঘাৎ অপঘাত মৃত্যুতে ফৌত হয়েছে। না হলে কোটি-টাকার সম্পদ ওর হাতে তুলে দিয়ে এভাবে কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে যেত না। ফলে, ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়াই এখন ঐ চোরাই মালের একচ্ছত্র মালিক। চোরা-বাজারে এটা বেচবার মতো হিম্মৎ তার নেই। তা সে চায়ও না। ইতালীর সম্পদ সে সাচ্চা ইতালীয়ানের মতো ইতালীতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই মর্মেই চিঠিখানা এইমাত্র পাঠালো। নিজের ঠিকানা জানায়নি। একটা পোস্ট-বক্সের রিটার্ন-অ্যাড্রেস-এ। চিঠির প্রাপক : আলফ্রেদো গেরি।ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নাম করা আর্ট ডীলার। ফ্লোরেন্স চেন তো? সেই যেখানে জন্মেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মিকেলাঞ্জেলো বুওনরত্তি। সেই যেখানে বসে লেঅনার্দো এঁকেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি : লা জ্যকোন্ডা! গেলি হচ্ছেন সেই ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে বড় দোকানের স্বত্বাধিকারী—'গ্যালারিয়া দ্য আৎ আন্তিকা এ মদার্না'।

লিখেছে দারুণ কায়দা করে। চিঠিখানা সহজ সরল ইতালীয়ান ভাষায় লিখে ধরেছে আয়নার সামনে। তারপর দর্পণ প্রতিবিম্ব দেখে দেখে কপি করেছে।

কেন জান? হুঁ-হু বাবা! তোমরা তা জানবে কেমন করে?

তোমারা তো ভিন্‌সেন্‌জোর মতো ইতালীতে মানুষ হওনি। শোন; বুঝিয়ে বলি—ঠিক ঐ ভাবে লিখতেন লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি! লিখেছিলেন আড়াই হাজার পৃষ্ঠার নোটবই! তিনি অবশ্য দর্পণে দেখে কপি করতেন না। টানা হাতেই ঐ ভাবে লিখতেন। কিন্তু ভিন্‌সেন্‌জো তো লেঅনার্দোর প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি। দর্পণ-প্রতিবিম্বে না দেখলে চিঠিটা পড়া যাবে না।

দোশরা ডিসেম্বর চিঠিখানা পেলেন প্রাপক। প্রথমে মিনিটখানেক কিছুই বুঝতে পারলেন না। তার পরেই বুঝে ফেললেন। আর্ট-কনৌশার তিনি। লেঅনার্দোর বিশ্ববিশ্রুত নোটবই বহুবার

ঘেঁটেছেন। দর্পণের সামনে ধরতেই পড়তে পারলেন চিঠিটা। আপন মনেই হেসে উঠলেন তিনি। দারুণ রসিক তো ছোকরা! দলা-পাকিয়ে চিঠিখানা ফেলে দিলেন ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। তারপর খামখানা তুলে নিলেন। পারীর ডাক-টিকিটে। এই মর্মান্তিক রসিকতা করতে লোকটা কিন্তু অনেক খরচ করেছে—এয়ারমেলের ডাক-টিকিটে। আবার তুলে নিলেন দলা-পাকানো কাগজটা। আবার পড়লেন। ভ্রু-দুটি কুঞ্চিত হল। মিনিটখানেক কী যেন চিন্তা করে তুলে নিলেন এবার টেলিফোনটা। ডায়াল করলেন বন্ধুবর পোগ্গিকে। জোভান্নি পোগ্গি হচ্ছেন ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিখ্যাত উফিজি সংগ্রহশালার ডিরেক্টার। তাঁকে বললেন, আজকের ডাকে আমি একটা মিস্টিরিয়াস্‌ চিঠি পেয়েছি। শুনুন—

পড়ে শোনালেন চিঠিখানা।

পোগ্গি জানতে চাইলেন, টাইপ করা চিঠি?

— আজ্ঞে না। হাতে লেখা। শুধু তাই নয়, মাস্টার আর্ট্রিয়াম লেঅনার্দোর মতো উল্টো করে লেখা—যা আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়।

কৌতূহলী পোগ্গি এসে চিঠিখানা পরীক্ষা করলেন। বললেন, নাইন্টি-নাইন পয়েন্ট নাইন-পার্সেন্ট চান্স হচ্ছে এটা কোনও মদ্যপের উৎকট রসিকতা অথবা উন্মাদের অহৈতুকী উচ্ছ্বাস। কিন্তু কথায় বলে...

উনি একটি ল্যাটিন প্রবাদবাক্য শোনালেন,যার বঙ্গানুবাদ—'যেখানে দেখিবে ছাই...'

গেরি চিঠি দিলেন না। টেলিগ্রাম করলেন : পত্রে উল্লিখিত চিত্রসহ স্বয়ং চলে আসুন। আমরা প্রতীক্ষারত।

ডিসেম্বরের নয় তারিখে তারবার্তার প্রত্যুত্তর এল : লেঅনার্দো আজ রওনা হচ্ছেন!

এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা তাপ্পি মারা ফ্ল্যানেলের জামা, জুতোর ভিতর থেকে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বেরিয়ে আছে— একজন ইতালিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্স থেকে ইতালীতে ফিরল। সোজা ফ্লোরেন্স। কাস্টম্‌স্‌ তাকে ভাল করে পরীক্ষাও করেনি ; করলেও তারা ধরতে পারত না যে,ওর কাঠের বাক্সটা দোতলা। ফ্লোরেন্সে এসে একটা একটা মাঝারি হোটেলে উঠল : আলবার্গো ত্রিপোলি-ইতালিয়া। ওর পকেটে এখনো দেড়শ ফ্রাঁ। এক দিনের হোটেল খরচা চলে যাবে। আর তাছাড়া তো...

হোটেলের কামরায় জুতো-জামা খুলে সে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। আর তার ভয় নেই। এখন সে স্বদেশে! বেশ কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে বসল। মুখে-চোখে জল দিয়ে নেমে এল রিসেপ্‌শান কাউন্টারে। একটা টেলিফোন করতে।

ফোন পেয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন গেরি। বললেন, আমি এখনি আসছি। কোন্‌ হোটেলটা বললেন? ত্রিপোলি-ইতালিয়া?

আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছালেন তিনি। একা নয়, সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু জোভান্নি পোগ্গি—উফিজির সর্বাধিনায়ক। পেরুগিয়া সবিস্তারে বর্ণনা দিতে শুরু করল—কীভাবে সে ছবিখানা দুবছর আগে অপহরণ করেছে। কিন্তু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জোভান্নি পোগ্গি বলেন, ওসব কথা পরে শুনব। প্রথমে ছবিখানা দেখান।

পেরুগিয়া হাসল। বিচিত্র হাসি। যে হাসি আজ চারশ বছর ধরে হাসছে তার নায়িকা—না, মাম্‌মি!

বলনে, বিশ্বাস হচ্ছে না, নয়? না হবারই কথা। ঠিক আছে স্যার, চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা আগে ভঞ্জন করে নিন, তারপর শোনাবো কী ভাবে এই ইতালিয়ান মেয়েটিকে বন্দী দশা থেকে উদ্ধার করেছি।

উবু হয়ে বসল সে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে। কাঠের বাক্সটার তলদেশ অপসারণ করতে। মিনিট দশেক বাদেই সে বের করে আনল ছবিটা।

ওঁরা দুজন সেখানা নিয়ে জানলার দিকে সরে গেলেন। আলোর কাছে, জোভান্নি পকেট থেকে বার করলেন একটা মস্ত ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস!

দীর্ঘ পনের মিনিট ঘর নিস্তব্ধ! তারপর পোগ্নি ছবি থেকে মুখ তুলে ঐ দীনবেশী ইতালিয়ানটার দিকে তাকালেন। হোক দীনহীন বেশবাস—ওর ভঙ্গিটায় সেই আর্ট কনৌশারের স্মৃতিতে ভেসে উঠল আর একটি বিশ্ববন্দিত শিল্পকর্ম : ফ্রান্স হাল্‌স্ এর 'লাফিং ক্যাভেলিয়ার!'

যেন মনে হচ্ছে ঐ মোনালিসা ছবিখানা সে নিজেই এঁকেছে।

গেরি বললেন, যদ্দূর মনে হচ্ছে এটা আসল ছবিখানাই। কিন্তু আমার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা না করে নিশ্চিত বলতে পারছি না।

ভিন্‌স্ বললে, বেশ তো করুন। পরীক্ষা করুন। কিন্তু পরীক্ষার যদি প্রমাণ হয় এটা খাঁটি, তাহলে আপনারা আমাকে কী দেবেন?

পোগ্নি বলেন, কী দাবী আপনার?

— অন্তত পাঁচ লক্ষ লীরা।

— এগ্রীড!—এককথায় রাজি হয়ে গেলেন গেরি।

ভিন্‌স্ একটু থতমত খেয়ে গেল। দরটা কম করে বলেছে নাকি? যাগ্‌গে মরুগ্‌গে। ইতালীর সম্পদ ইতালীতে ফিরে এল এটাই তো আসল কথা। তার বর্তমান অবস্থা কপর্দকহীন—তাই কিছু চাইতে হল।

অধ্যাপক পোগ্নি বললেন, অবশ্য দু-একদিন দেরী হতে পারে। কারণ এতবড় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার আগে আমাদের রোম থেকে অনুমতি নিতে হবে।

—ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি করবেন শুধু। আমার জেব-এ এখন এক বোতল বীয়ার কেনার মত পুঁজিও নেই।

গেরি একটা পাঁচ হাজার লিরার নোট বাড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এটা আপনাকে ধার দিচ্ছি। যেহেতু ঐ ইতালিয়ান মহিলাটিকে উদ্ধার করতে আপনি সর্বস্ব ব্যয় করেছেন।

— ধন্যবাদ।

পেরুগিয়া তৎক্ষণাৎ এক প্লেট বোনলেস্ ফ্রায়েড চিকেন আর এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিল।

গেরি আর পোগ্নি বেরিয়ে এসেই টেলিগ্রাফ করলেন রোমের ফাইন-আর্টস্ বিভাগের ডিরেকটার-জেনারেল কোরাদো রিচ্চিকে।

তারবার্তা পেয়ে স্তম্ভিত রিচ্চি স্বয়ং চলে এলেন ফ্লোরেন্স।

পরদিন বারোই ডিসেম্বর ওঁরা তিনজনে যখন পেরুগিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তার আগেই সাদা পোশাকের পুলিসে ঘিরে ফেলেছে ঐ অখ্যাত হোটেলটি। পেরুলিয়া ওঁদের তিনজনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়, স্বাগতম্ স্যার! দেখুন, ইতালীর জন্য কী সম্পদ আমি নিয়ে এসেছি!

বাক্স থেকে ছবিখানা বার করে সে রিচ্চির হাতে তুলে দেয়। তিনি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দ্বারের দিকে কাকে যেন ইঙ্গিত করলেন। তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র পুলিস বেয়নেট উঁচিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

ওর হাতে যখন হাতকড়া পরানো হচ্ছিল তখন স্তম্ভিত লোকটা শুধু বললে, এর মানে?

সিটি-পুলিসের প্রধান বললেন, মোনালিসা অপহরণের দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে মসিয়োঁ!

বজ্রাহত হয়ে গেল সরল মানুষটা। ওর গলকণ্ঠটা বহুদিন পরে আজ ওঠানামা করল। কোনক্রমে আমতা-আমতা করে বলে, বাঃ! অপহরণ? আমি? অপহরণ তো করেছিল সেই শালা নেপলিয়ঁ! আমি তো উদ্ধারকারী।

পরদিন সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে বিভিন্ন ভাষায় ওটাই ছিল হেড-লাইন নিউজ : 'মোনালিসাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে।'

সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি লোক চমকে উঠেছিল খবরটা পড়ে।

তাদের মধ্যে ছয়জনের চমক বিশেষ 'অর্থবহ'। যে ছয়জন শাঁদ্রর আঁকা ছয়খানি অরিজিনাল মোনালিসা' খরিদ করে এতদিন আত্মতৃপ্ত ছিলেন! আর চম্‌কায়নি একজন—মরক্কোর একটি স্পা-তে প্রমোদ ভ্রমণরত জনৈক আর্জেন্টাইন বৃদ্ধ—এখন যিনি স্বনামে জীবনযাপন করেন : মার্কুইস্ এদুয়ার্দো দে ওয়ালফিয়েনো। তাঁর আশঙ্কা ছিলই—এমন ঘটনা যে কোন দিন ঘটতে পারে।

পরের ইতিহাস সারা পৃথিবীর পক্ষে আনন্দের। শুধু একটি ব্যতিক্রম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফ্লোরেন্সের নগরপাল ও পুলিস-চীফ অভিনন্দন বার্তা পেতে থাকেন। ইতালী সরকার ফরাসী সরকারকে জানালেন— লেঅনার্দোর আঁকা ছবিখানা তাঁরা প্রত্যর্পণে স্বীকৃত, শুধু কয়েকটি ছোটখাটো শর্ত আছে। এক নম্বর : ঐ ছবিখানা ইতালীর তিনটি শহরে প্রথমে প্রদর্শিত হবে—ফ্লোরেন্স, রোম ও মিলান। দ্বিতীয়ত, অপহরণকারী ইতালিয়ানটির বিচার ইতালীতেই হবে।

দুটি শর্তই ফরাসী সরকার সানন্দে মেনে নিলেন।

প্রায় মাসখানেক ইতালীর তিনটি শহরে প্রদর্শিত হয়ে বিশেষ প্রহরায় 'লা জ্যকোন্ডা' রওনা হল পারীর দিকে। সেটি তের সালের শেষ দিন। চৌঠা জানুয়ারী 1914 সালে অর্থাৎ ইতালী ও ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কয়েক মাস আগে সাড়ম্বরে প্রদর্শিত হল সেই ছবিখানা ল্যুভারের সালোঁ কেয়ারে।

গোনা-গুনতি দু-বছর চার-মাস চৌদ্দ দিন পরে।

ইতালীতে এবার শুরু হল পেরুগিয়ার বিচার!

জনমত দ্বিধাবিভক্ত। একদল মনে করেন—ঐ সরল অশিক্ষিত লোকটা জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যে— ইতালীর অপহৃত সম্পদ ইতালীকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে এই বিশ্বাসে—এ কাজটা করেছে। তাকে ক্ষমা করা উচিত। অপর দল বলেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলে সে পাঁচ লক্ষ লীরা দাম চাইবে কেন?

পেরুগিয়া তার জবানবন্দীতে সিনর-এর উল্লেখ আদৌ করল না—তা করলে সে নিজে লোকের চোখে খাটো হয়ে যায়, তার নারী উদ্ধারের থিয়োরিটা দাঁড়ায় না। এমনকি লাঙ্গিলোত্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের

উল্লেখও সে করল না। সমস্ত কৃতিত্বটা সে একাই দাবী করল—সমস্ত দায়িত্বটাও সে একাই বহন করতে চাইল। হয়তো সে মনে করেছিল, এভাবেই সে জনসমর্থন পাবে অথবা যে নাটকটা সে মনে মনে লিখেছে সেটাই সে আন্তরিকভাবে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। কোনটা সত্য বলা কঠিন।

বিচারকালে পাব্‌লিক প্রসিকিউটার সবিস্তারে জানালেন যে, 'মোনালিসা' আদৌ নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কর্তৃক অপহৃত হয়নি। সেটা চিত্রকর লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি স্বয়ং বিক্রয় করেছিলেন ফরাসী সম্রাটকে। ফলে প্রতিবাদীর দাবী আদৌ ধোপে টেকে না! তাকে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত।

এবার সওয়াল করতে উঠলেন আসামীপক্ষের আইনজীবী। পেরুগিয়া উকিল দিতে পারেনি। তার বৃদ্ধ বাবা এসে বসেছিল দর্শকদলের একান্তে ; কিন্তু উকিল দেবার ক্ষমতা তারও ছিল না। উকিলের খরচ জুগিয়েছিল ইতালীর সাধারণ মানুষ—চাঁদা তুলে। তারা ঐ প্রায়-নিরক্ষর রঙ-মিস্ত্রিটাকে ভালবেসে ফেলেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল—ও সাচ্চা ইতালিয়ানদের মতো জাতীয় সম্পদ স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছে। হ্যাঁ, ঠিক কথা—'মোনালিসা'খানা নেপোলিয়ঁ অপহরণ করে নিয়ে যায়নি ; কিন্তু অসংখ্য অমূল্য শিল্পসমপদ যে সেই বোম্বেটেটা ইতালী থেকে লুট করে নিয়ে গেছিল, এ-কথাটা তো মিথ্যে নয়। গত একশ বছর তার প্রতিবাদে ইতালী কিছুই করতে পারেনি। ঐ অশিক্ষিত রঙ-মিস্ত্রিটা তার জাতীয়তাবোধের উন্মাদনায় পারী-পুলিসের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে জাতীয় বীর!

আসামীপক্ষের আইনজীবীও সেই মর্মে সওয়াল করলেন। বললেন, 'সহযোগী যে কথা বলেছেন তা অবান্তর। 'মোনালিসা' ছবিখানা ইতালীর শিল্পীই এঁকেছেন—সেটা কীভাবে ল্যুভারে গিয়েছে এ তথ্য অবান্তর। এ মামলায় বিচার্য : আসামী নিজ বিশ্বাস-অনুযায়ী কী জানত? কোন্ প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সে এ-কাজ করেছে! আসামীর মানসিকতাই এক্ষেত্রে বিচার্য —মোনালিসা ছবির ইতিহাস নয়। ধর্মাবতার ! আমার সহযোগী বলেছেন—আসামী রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছিল ; কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণে সর্পটা মিথ্যা কিনা তা আমাদের বিচার্য নয়, আমাদের বিচার্য ভ্রমাত্মক ব্যক্তির সর্পভীতিটা সাচ্চা কিনা।

বিচারক আইনের শৃঙ্খলে বন্দী। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবী সকৌতূহলে জানতে চায়—বিচারে তিনি কী রায় দেন। বিশেষ করে ফ্রান্স! ফ্রান্সের পুলিস বিভাগ! তাঁর বিচারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও জড়িত! ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শিল্পাহরণে এই বিচার 'রেফারেন্স' হিসেবে উদ্ধৃত হবে।

তাই তিনি ঘোষণা করলেন : আসামী দোষী!

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর গলকণ্ঠটা ওঠা-নামা করল না কিন্তু। সে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত! যেন কারারা-মার্বেলে গড়া মিকেলাঞ্জেলোর এক বন্দী!

দর্শকের আসনে-বসা একটি বৃদ্ধ পকেটে থেকে রুমাল বার করলেন নিঃশব্দে।

—দোষী ; কিন্তু সব দিক বিচার করে, বিশেষত আসামীর নিজস্ব ধারণার কথা বিবেচনা করে আইনের ধারা-মোতাবেক আমি তার নিম্নতম শাস্তি বিধান করছি : সাত মাস বিনাশ্রম কারাবাস। তবে যেহেতু আসামী গ্রেপ্তারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বসমেত সাতমাস নয়দিন হাজতবাস করেছে —জামিন পায়নি—তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে তার পূর্ণ মেয়াদ খেটেছে।

তাই অভিযুক্ত আসামীকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করলেও আমি আর তাকে এই মুহূর্তে মেয়াদ-অন্তে-মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে ওঠে।

উনত্রিশে জুলাই উনিশ'শ চৌদ্দ সালে 'মোনালিসা অপহরণ অপেরা'র নায়ক বেরিয়ে এল জেলখানা থেকে।

আজ সে অ-কোটিপতি অকপট কপর্দকহীন!

ওর উকিল জানতে চাইল, কোথায় যেতে চান এখন? দেশের বাড়িতে? ক্লান্ত বিষন্ন মানুষটা বলল, সেখানে যাবার মুখ নেই। আমাকে সেই হোটেলটায় পৌঁছে দিন—যেখানে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—সেই ত্রিপোলী-ইতালিয়ায়।

উকিলবাবু হেসে ফেলেন, সরি! ফ্লোরেন্সে আজ ঐ নামে কোনও হোটেল নেই!

— মানে? ক'মাস আগেও আমি যে ঐ হোটেলে—

— জানি! কিন্তু আপনার কৃতিত্বে হোটেলের মালিক নামটা পাল্‌টে দিয়েছে।

ওর নাম এখন : লা জ্যকোন্ডা!

আজ যদি ল্যুভারে যান তবে 'মোনালিসা'কে সালোঁ কেয়ারে দেখতে পাবেন না। এখন তা রাখা আছে 'সালে দে এতাৎ' কামরায়। আমি কিছুদিন আগে, 1984 সালে, মোনালিসার পাশাপাশি দেখেছিলাম লেঅনার্দোর 'মাদোনা অফ দ্য রকস্', 'বাকাস', রাফায়েলের 'মাদোনা' ইত্যাদি। পাশের প্রাচীরে ছিল 'ভেরোনিজ'-এর আঁকা কয়েকটি চিত্র এবং বিপরীত প্রাচীরে টিশিয়ানের। অর্থাৎ ছবি সাজানোর কায়দাটা এই অর্ধ-শতাব্দীতে বদলানো হয়েছে। যা বদলায়নি তা হচ্ছে 'মোনালিসা'-চিত্রের সম্মুখে দর্শকের ভীড়।

তা হোক, 'সালে দুশেতেল হল-কামরায়' সেই ছোট্ট গুদামঘরটি আজও আছে। যেখানে ঐ হতভাগ্য পেরুগিয়া একটি রাত কাটিয়েছিল। মোনালিসা যে কুলুঙ্গিটায় বুলেট-প্রুফ আবরণীর ভিতর এখন বাস করে সেটি আর্দ্রতা ও উত্তাপ-নিয়ন্ত্রিত। কার্ল ডেকারের গবেষণা-গ্রন্থ থেকে জানতে পারা গেল শার্দ্র ঐ মোনালিসার পরে আর কোনও নকল ছবি বিক্রির কারবারে কখনো ছিলেন না। পারীর কাছেই অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটিয়ে ছিলেন। পেরুগিয়াকে দুমেঞ্জার মানুষ বীরের সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত হয়নি । তাঁকে ওরা কাঁধে তুলে নেচেছিল! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে যোগদান করে বন্দী হয়, এবং যুদ্ধান্তে উনিশ সালে মুক্তি পায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীতে বেচারি কোনও কর্মসংস্থান করতে পারে না। নিজের নামের মাঝের অংশটাই পদবী বলে চালিয়ে সে সীমান্ত অতিক্রম করে ফিরে আসে পারীতে । একুশ সালে সে একটি ইতালীয়ান পুষ্পব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করে ; আর পারী উপকণ্ঠে 'সেন্ত্-মর-দে ফোসে' অঞ্চলে একটা বস্তিতে বসবাস করত। উনিশশ' পঁচিশ সালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বেচারীর সব যন্ত্রণার অবসান ঘটে। শেষ জীবনে অর্থকৃচ্ছতায় সে যথেষ্ট কষ্ট পায়। বস্তুত —অনাহার আর অপুষ্টিই তার অকালমৃত্যুর কারণ!

অপর পক্ষে পরমকারুণিকের দয়ায় এই পৃথিবীতে—যে বিকৃত দুনিয়া সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আই কুড হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ বেটার ওয়ার্ল্ড'—মার্কুইস্ এদুয়ার্দো দে ওয়ালফিয়েনো দীর্ঘ আশি বৎসর বহাল তবিয়তে বাঁচেন। বিয়ে-থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়েননি। বিশ্বের

বিভিন্ন-প্রান্তে ভ্রমণ-বিলাসীর জীবনযাপন করে যান। প্রতিটি প্রমোদভ্রমণে অর্থমূল্যে শয্যাসঙ্গিনী। অর্থোপার্জনের প্রশ্নই ওঠেনি। শাঁদ্রর আঁকা ছয়খানি ছবির প্রতিটিই তিনি বিক্রয় করে ফেলেছিলেন—মোনালিসা পুনরুদ্ধারের আগেই—গড়ে তিন লক্ষ মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ সর্বমোট তাঁর আয় হয় এক-কোটি আশি লক্ষ ডলার। সে-আমলের হিসাবে তা প্রায় বিশ কোটি টাকা! বর্তমান বাজারদরে কত শ কোটি টাকা হবে বলতে পারি না।

পেরুগিয়ার জবানবন্দীতে 'সিনর'-এর উল্লেখ ছিল না। ফলে পুলিসে কোন দিনই তাঁর খোঁজ করেনি। আন্তর্জাতিক চোরা কারবারীদের কল্যাণে তাঁর অর্থ গচ্ছিৎ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে—সিংহভাগ সুইজারল্যান্ড! নিরুপদ্রব কামিনীকাঞ্চন- কলঙ্কিত জীবন। তিনি এতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, মার্কিন সাংবাদিক কার্ল ডেকারকে ডেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মোনালিসা অপহরণ কাহিনীটি সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন। একটি মাত্র ছোট্ট শর্ত ছিল তাঁর— ডেকার যেন মার্কুইসের দেহাবসানের পূর্বে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থটি প্রকাশ না করেন। সে শর্ত অনুযায়ী কার্ল ডেকার তাঁর পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন বাক্সবন্দী করে রেখে দেন। এই গবেষণা-গ্রন্থটি সমাপ্ত করার তাগিদেই ঐ যুবক সাংবাদিকটি পারীতে এসেছিলেন পেরুগিয়ার জবানবন্দী নিতে—বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাহিনীটি শুন্‌তে। তিনি জানতেন, পেরুগিয়া সেই উনিশ শ চব্বিশ সালে 'পেত্রো' ছদ্মনামে সস্ত্রীক পারীতে ফিরে এসে সাবেক রঙ-মিস্ত্রির জীবিকায় দিনাতিপাত করছেন।

উনিশ শ' চব্বিশের সেই তেরই এপ্রিলের দিনটি। পারী-প্রান্তের সেই পাব্-হাউস।

সারাটা সকাল ধরে পেরুগিয়া বক্‌বক্ করে গেছে। শুনিয়েছে তার মনে মনে-লেখা 'মোনালিসা অপহরণ অপেরা'। ইতিমধ্যে চারটি বীয়ারের বোতল শেষ হয়েছে তার। কার্ল ডেকার মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে হারিয়ে যাওয়া খেইতে কথাকোবিদকে ফিরিয়ে এনেছেন। মাঝে মাঝে নোটবইতে সাল-তারিখ-নাম-ধাম লিখে গেছেন। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে কোটরগত ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে মদ্যপটা বললে, আপনি পুরো একশ ফ্রাঁ মজুরি দিয়েছেন আমাকে। তদুপরি এই বীয়ারের বন্যা! বলুন মসিয়োঁ সাংবাদিক! আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার? আমি আজ বলব...সব কথা বলতে রাজি! আমি আজ দিলখুশ্! পুরো একশ ফ্রাঁ একদিনের মজুরি কোন শালা দেয়?

ডেকার বললেন,মোটামুটি সব কথাই বলেছেন আপনি। শুধু একটি প্রশ্ন। সকালেই আপনি বলেছিলেন, মার্কুইস্-এর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল বছর-দুই আগে। সেই গল্পটা এবার শোনান।

— শোনাব ! আলবৎ শোনাব! একবেলায় একশ ফ্রাঁ কোন শালা দেয় ? কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে একটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন তো মসিয়োঁ সাংবাদিক? ঐ শালার প্রশ্নটা আজ তের বছর ধরে আমার মগজটা গুব্‌রে পোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে!

— কী প্রশ্ন ? বলুন ?

-- রঙের টেক্কাটা এই শালা পেরুগিয়ার আস্তিনের তলায় লুকনো রইল— অথচ হারামজাদা সিনরটা কেন ফিরে এল না আমার ডেরায়? ভিক্ষা চাইতে ?

কার্ল ডেকারের করুণা হল। আশ্চর্য! এই সহজ সরল মানুষটা সে কথা আজও জানে না! সব কথা খুলে বললেন তিনি। কী কারণে মার্কুইস্ অরিজিনালখানা কোনদিনই নিতে আসেনি। মদ্যপটা এবার বললে, অব সমঝ্‌লম্! অ্যাদ্দিনে স্বীকার করছি : হারামজাদাটা ন্যায্য কথাই বলেছিল সেদিন।

— কী কথা ?

— আমি শালা একটি এক-নম্বরের ইডিয়ট!

— এবার আপনি শোনান, কবে কি-করে দু-বছর আগে ওকে দেখেছেন।

— শোনাব । তাহলে কিন্তু গলাটা আর একটু ভেজাতে হবে; আর সব সিগ্রেট খতম হয়ে গেছে।

— শ্যিওর!

এল আর একটা বীয়ারের বোতল। সিগ্রেটের কার্টুন। পেরুগিয়া শুরু করে শেষটা ।

বছর দুই আগে 'পেত্রে' ছদ্মনামে সে যখন সীমান্ত অতিক্রম করে সস্ত্রীক পারীতে চলে আসে তখন তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পারীতে সে কর্ম-সংস্থান করে উঠতে পারে না। অনেক-অনেক ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে। তারা বেকার। ফরাসী সরকার চাকরির ক্ষেত্রে তাদেরই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। শুধু সরকার নয় সাধারণ মানুষও পেত্রো-কে একটি বেকার-যুবক হিসাবে দেখত না।—দেখত ইতালিয়ান হিসাবে।

হনিমুনে পারীতে এসে ভিন্স তার নবপরিণীতাকে ল্যুভারটাও দেখাতে নিয়ে যেতে পারেনি। শুধু অর্থের অভাবে নয়; ওর ভয় ছিল—যদি সেই পরিচিত কর্মীরা ওকে চিনে ফেলে! সেই পপাদুঁ, পিকোয়ে, সভে! অঁরি দ্রিয়োর বিচার-বিভাগীয় তদন্ত-রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর তাদের অনেকেরই 'ডিমোশান' হয়েছে, 'ইন্‌ক্রিমেন্ট' বন্ধ হয়েছে। চিন্‌তে পারলে তারা পেরুগিয়াকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই এবার পারীতে এসে সে সাহস করে ল্যুভারে পদার্পণই করেনি।

তবে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বেকার মানুষটা একদিন দেখা করেছিল মসিয়োঁ পন্তিফ্-এর সঙ্গে। ওর প্রাক্তন মনিব—গোবিয়ার গ্লেজিয়ার প্রতিষ্ঠানের মালিক। দপ্তরে নয়, তাঁর বাঙলোতে। অফিসে দেখা করতে তার সঙ্কোচ হয়েছিল—লজ্জা! পন্তিফ্ ওকে চিনতে পারলেন। বললেন,পেরুগিয়া,আমি তোমার ব্যাপারটা জানি। হয়তো সবটা নয় ; কিন্তু পারীর খবরের কাগজেও ইতালীর আদালতে তোমার যে বিচার হয়েছিল সে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তোমাকে চাকরি দিতে পারি; কিন্তু তুমিই বিবেচনা করে দেখ—আমার কোম্পানিতে আবার জয়েন করা কি তোমার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে?

কোটরগত একজোড়া চোখ ওঁর দিকে মেলে পেরুগিয়া জানতে চায়, কেন স্যার? ওরা কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? ঐ—পীতির, লেও, রবার্তো, ম্যাক্স খুড়ো? ওদের তো কোন ক্ষতি আমি করিনি? হ্যাঁ, আচম্‌কা কিছু ফ্রাঁ হাতে এসেছিল—ফুর্তি করে উড়িয়েছি, তাতে ওদের চোখ টাটিয়েছে! ব্যস্! তাতে কী? ওরা কেউ ওভাবে হঠাৎ লটারিতে ফ্রাঁ পেলে ওড়াবে, তখন আমার চোখ টাটাবে! শোধবোধ! সেজন্য ওরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না কেন?

পন্তিফ্ বলেন সে কথা নয়, ভিন্স! কিন্তু ওখানে তোমাকে যে সবাই চিনে ফেলবে। 'পেত্রো' ছদ্মনামটা যে ওখানে চালানো যাবে না। পারী পুলিস তোমাকে চিনে ফেলবেই!

— কিন্তু আমার বিচার তো ইতালীতেই হয়ে গেছে স্যার! ফ্রান্স তো প্রতিশ্রুত—আমাকে হেনস্তা করবে না!

— তুমি বুঝতে পারছ না ভিন্স! পুলিসের আক্রোশটাতো যায়নি। তুমি যে গোটা বিভাগটার গালে থাপ্পড় কষিয়েছিলে এটা কি ওরা ভুলতে পারে? ওরা তো তোমাকে ফাটকে দেবে ছদ্ম-পরিচয়ে

ফ্রান্সে আসার জন্য।

তা বটে ! মাথাটা নিচু হয়ে গেল ভিন্স-এর।

পন্তিফ্ বললেন, তার চেয়ে এক কাজ কর। আমি একটা ইন্ট্রোডাক্শন লেটার দিচ্ছি। তুমি মার্কুইস ওয়ালফিয়ার্নোর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। একজন দক্ষিণ আমেরিকান ধনকুবের। পারীর উপকণ্ঠে ওঁর একটা বাগানবাড়ি আছে—'শাতু দ্য লিজা'—আসলে 'শাতু' বা দুর্গ নয়, প্রমোদভবন। সেটা ফাঁকাই পড়ে থাকে, একজন কেয়ার-টেকারের হেপাজতে। আমাদের কোম্পানি বাৎসরান্তিক রঙ-ফেরায়। আমার সঙ্গে অবশ্য তাঁর মৌখিক আলাপ নেই। তবে আমাকে তিনি চেনেন। উনি বছরে একবার পারী বেড়াতে আসেন। এ সপ্তাহে এসেছেন। আমি অনুরোধ করলে তিনি তোমাকে ঐ প্রমোদভবনের 'মালি' করে দিতে পারেন। প্রকাণ্ড বাগান আছে, ফুলের আর ফলের—আপেল, আঙুরের।

'মালি'-র চাকরি করবে?

ভিন্স হাতে স্বর্গ পেল! ওর নবপরিণীতা বধূ ফুল খুব ভালবাসে। তার বাপের ছিল ফুল-সরবরাহের কারবার। কিশোরী বয়সে ফুলের মধ্যেই কেটেছে ঐ ফুলের মত মেয়েটির জীবন। এক কথায় রাজি হয়ে গেল ভিন্স! মার্কুইস্ ওয়ালফিয়েনোর নাম সে জীবনে শোনেনি। তাঁর নামে লেখা পন্তিফ্-এর পরিচয়-পত্রটা নিয়ে দেখা করতে গেল ধনকুবেরের সঙ্গে।

বিরাট প্রাসাদ। বিশাল বাগিচা। কম্পাউন্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘের মতো এক জোড়া গ্রেট ডেন। পন্তিফ্-এর পত্রখানা না থাকলে ঐ ধনকুবেরের বৈঠকখানা পর্যন্ত বেচারি যেতেই পারত না। ম্যানেজার চিঠিখানা দেখে ভ্যালেকে দিলেন। সে কিছুক্ষণ পরে ওকে ডেকে নিয়ে গেল ধনকুবেরের ড্রইংরুমে । সাহেব তখন সেখানে সস্ত্রীক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। —সস্ত্রীক ? না! সহধর্মিণী! মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিল ভিন্স। পারীর এক বিখ্যাত ব্যালে-ডান্সার!

তার ছবি বহুবার দেখেছে পোস্টারে।

মার্কুইসকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেল সে!

গোঁফ-দাড়ি কামানো, প্যাঁশনে নেই, রিমলেস্ চশমা, তবু চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না ওর।

চিনলেন সিনরও। কিন্তু কেউই সে-কথা স্পষ্টাপষ্টি স্বীকার করলেন না। পন্তিফ্-এর চিঠিখানা পড়ে মার্কুইস ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইতালিয়ান?

— কী নাম তোমার?

— ভিন্সেন্জো পেত্রো। —মুখ নিচু করে বললে ভিন্স্।

— তোমার কোন যমজ ভাই আছে?

এবারে নেতিবাচক গ্রীবাসঞ্চালন করল।

পারী সুন্দরী গব্লেটে শ্যাম্পেন ঢালছিলেন। হঠাৎ থমকে পড়েন। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে মার্কুইসকে প্রশ্ন করেন—হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? মার্কুইস হেসে তাকে বললেন, তুমি বুঝবে না, হানি! ভিন্স বুঝেছ। ঠিক ওর মতো দেখতে আর একজন ইতালিয়ানকে আমি এককালে চিনতাম। সে ছোকরা ছিল পাক্কা ইডিয়েট! তার নাম ছিল : ভিন্সেন্জো পেরুগিয়া! অবশ্য তার মানে এ নয় যে, পেত্রোও একজন ইডিয়েট!

ব্যালে ডান্সার কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভিন্স্-এর দিকে তাঁর ভুবন-মোহিনী চোখ জোড়া তুলে তাকালেন।

আর সহ্য হল না ভিন্স-এর। সেই খণ্ড-মুহূর্তে সে ভুলে গেল দ্বারপ্রান্তে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে মার্কুইস এর এক কাফ্রি দেহরক্ষী—বাগানে ঘুরছে একজোড়া ভীষণদর্শন গ্রেট ডেন। পারী-সুন্দরীর চোখে-চোখ রেখে ভিন্স্ বলে ওঠে, এমন ভুল মানুষের হয়, মাদাম। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমিও একজন ব্রিটিশারকে এককালে চিনতুম। সে হারামজাদা ছিল পাক্কা জুয়াচোর। তার নাম : ডক্টর স্যামুয়েল রিচার্ডসন! অবশ্য তার মানে এ নয় যে...

— এনাফ! তুমি যাও এখন! ম্যালকম্!

বোঝা গেল ওঁর দেহরক্ষীর নাম 'ম্যালকম্'। কারণ সে লোকটা এক-পা এগিয়ে এল।

— ওকে গেটটা পার করে দাও! দেখ, 'ডেভিল' যেন না কামড়ায়!

ম্যালকম্ এসে ভিন্স-এর হাতটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরল। এস্কট করে প্রমোদ-ভবনের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল!

— এই আমার সেই শয়তানটার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কাহিনী! —কোনক্রমে বল্লে মাতালটা। প্রশ্ন করল, আর কিছু জানতে চান মসিয়োঁ সাংবাদিক? প্রশ্ন থাকে তো বলুন। আমি আজ ন্যাংটো হতে প্রস্তুত। সব কথাই খুলে বলব! একবেলার জন্য একশ ফ্রাঁ কোন শালা দেয়?

কার্ল ডেকার বললেন, না মসিয়োঁ পেত্রো। আর কিছু প্রশ্ন নেই আমার। চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই—

— কেন? কিসের জন্য? তুমি ভেবেছ পেত্রো-শালা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে? পাঁচ বোতল বীয়ারে? ফুঃ! এককালে বোতল-বোতল শ্যাম্পেন উড়িয়েছে এই শর্মা, তা জান? পারীর খানদানি বার-এ!

— জানি! আসুন আপনি। উঠুন!—ভিন্স-এর বগলের তলায় হাত দেয়।

ঝট্কা মেরে তাকে সরিয়ে দেয় মাতালটা। বলে, কিস্সু সাহায্য চাই না, বুঝেছ? আমি এখন ঘুমোব।

গুঁড়ি মেরে সে উঠে পড়ে টেবিলটায়। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

কার্ল ডেকার অসহায়ভাবে বার-ম্যানের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

লোকটা এগিয়ে এসে বল্লে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, মসিয়োঁ। ভিন্স্খুড়ো আমাদের পাড়ার রঙ-মিস্ত্রি। খোঁয়াড় ভাঙলে ও নিজেই উঠে চলে যাবে। প্রয়োজন হলে, আমি তাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

ডেকার বিল মিটিয়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান।

ঠিক তখনি কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল মাতালটা। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, মসিয়োঁ সাংবাদিক! তুমি তো আমার মতো আনপড় নও! তুমি পণ্ডিত। সারাটা সকাল ধরে নানান প্রশ্ন করেছ আমাকে। এবার আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দাও দেখি? জবাব ঠিক হলেই তোমার ছুটি; আর ভুল হলে আবার আমি তোমার ঘাড়ে চেপে বসব! আমাকে বীয়ার খাওয়াতে হবে।

কার্ল ডেকারের মনে পড়ে গেল একটা ভারতীয় উপকথার কাহিনী।—একটা প্রেতাত্মা গাছের ডাল থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে আর একজন ভারতীয় রাজাকে বলছে, —বল, রাজা বিক্রম, গল্পটা শুনেছ, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও...

— এক নম্বর প্রশ্ন : আনপড় ভিন্‌সেন্‌জো পেরুগিয়ার জীবনে চরমতম বেদনার মুহূর্ত কোনটি ?
ধুরন্ধর মার্কিন সাংবাদিক বললেন, সেই যখন ত্রিপোলী-ইতালীয়ার হোটেলে পুলিস-চীফ আপনার হাতে হাত-কড়া পরাতে এগিয়ে এলেন।
অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল মাতালটা। বললে, হয়নি, হয়নি, ফেল! না! জীবনের চরমতম আঘাত পেলুম যখন বিচারালয়ে উকিলবাবু বুঝিয়ে বললেন— ইতালীয়ান শিল্পী নিজেই বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন... মাঝপথেই থেমে পড়ে। আচমকা একটা হেঁচ্‌কি সামলাতে গিয়ে।
পাদপূরণ করেন ডেকার, জানি! লা জ্যকোন্ডার সেই ছবিখানা!
— না! আমার মাম্মিকে!
লোকটা এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য বদ্ধ মাতাল!
নিঃশব্দে কার্ল ডেকার কেটে পড়তে চাইলেন। পিছন ফিরতেই গর্জন করে উঠল লোকটা, এ্যা—ও! পালাচ্ছ কোথায় ?
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন আবার। বলেন, কেন ? কী হল ?
— দু-দুটো প্রশ্ন করব বলেছি না ? দ্বিতীয়টা যে এখনো বাকি! এবার বল তো বাছাধন, এই আনপড় ইতালিয়ানটার জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত কোনটি ?
— যখন দুমেঞ্জার মানুষ আপনাকে কাঁধে তুলে নাচছিল ?
— ধূ-স্‌! তুমি দেখছি আমার চেয়েও বড় জাতের ইডিয়ট, মসিয়োঁ লা সাংবাদিক! সেটা তো আমার চরম লজ্জার মুহূর্ত! আমার ...আমার...জীবনের সার্থকতম মুহূর্ত কোন্‌টি, তাই আমি এখন জানতে চাইছি। ঠাকুর্দার নাতি হিসাবে—শিল্পী হিসাবে দুনিয়াকে কী আমি দিয়ে গেলুম ?
কার্ল ডেকার বুঝে উঠতে পারেন না—কোন্‌ জবাবটা শুনলে ঐ মদ্যপটা ঠাণ্ডা হবে। সে নিজেই দাখিল করল সমাধান : সেই যখন বাপির কাছ থেকে উপহার পাওয়া গ্রান্ড-পার তুলিটা তুলে নিয়ে বুঝতে পেরেছিলুম—মোনালিসা আমার প্রেয়সী নয় : মা! আজ আমি মাতাল হইনি, কিন্তু সেদিন বেহেড মাতাল হয়েছিলুম! গ্রান্ড-পা ছিল সাঁচ্চা শিল্পী! তার তুলির আশীর্বাদেই আমার মা কানা হয়ে যায়নি, বুঝলে ?
— হ্যাঁ, বুঝেছি!
— হ্যাঁ! কথাটা লিখে দাও তোমার গবেষণা-গ্রন্থে! মোনালিসার চোখ দুটো এঁকেছিলেন ভিঞ্চি গাঁয়ের এক বাস্টার্ড শিল্পী, আর সেই চোখ জোড়াকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল লেট ল্যামেন্টেড্‌ জোভান্নি পেরুগিয়া দ্য দুমেঞ্জার নাতি, এই দীনাতিদীন রঙ-মিস্ত্রিটা! বেহেড মাতালটা!
ধ্রাশ করে শুয়ে পড়ল আবার।
পানশালা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আবার একবার পিছনে ফিরে তাকালেন কার্ল ডেকার। মাতালটার মাথা আর দুটো হাত টেবিল থেকে উল্টোদিকে ঝুলছে! কঙ্কালসার মানুষটার। যেন শিংশপা বৃক্ষ থেকে প্রলম্বিত এক অশান্ত প্রেতাত্মা : বেতাল!

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com